হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল

মাওলানা মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

মদীনা পাবলিকেশান্স
www.almodina.com

হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল

(প্রামাণ্য দলীলভিত্তিক)

সম্পাদনা
মাওঃ আবূ বকর সিদ্দীক এম.এ.
সহঃ অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
শ্যামনগর মহসিন ডিগ্রী কলেজ, সাতক্ষীরা

মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শাখা ঃ ৫৫বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল

(প্রামাণ্য দলীলভিত্তিক)

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪২৩ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৪০৯ বাংলা
জুন ঃ ২০০২ ইংরেজী

প্রচ্ছদ ঃ
মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস্
৫৫ বি. পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
এস.টি. কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৭০ টাকা মাত্র

ISBN-984-8367-82-2

উৎসর্গ

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) স্মরণে

পেশ কালাম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি যে, 'হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল' পুস্তকটি মুসলিম জনগণের নিকট পেশ করতে পেরেছি।

আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, বা যা আদেশ করেছেন, তা গ্রহণ কর বা মান্য কর এবং যা নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর) নবী করীম (সাঃ) যে সমস্ত কাজ করেছেন, যে সকল কথা বলেছেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অবশ্য পালনীয়। উল্লেখ্য যে, সে সমস্ত বিধান কোনটি ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত এবং কোনটি মুস্তাহাব। এছাড়া নবী করীম (সাঃ) যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা কোনটি কুফ্‌রী পর্যায়ের গুনাহ, কোনটি কবীরা গুনাহ, কোনটি মাকরূহে তাহরীমী এবং কোনটি মাকরূহে তানযীহী বা ছোট গুনাহ।

হাদীসের কিতাবসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোন কোন বিষয় সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কথা ও কাজের মধ্যে বাহ্যিক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এটা ব্যতীত নবীজীর (সাঃ) জীবনের প্রথম দিকের আমল ও মতামত এক রকম ছিল এবং শেষের দিকে অন্যরকম ছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই বৈপরীত্যের সমাধান করা খুবই কঠিন। তখন এই সকল বিষয়ের সঠিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলিম ও মুজতাহিদের প্রয়োজন। তাবিয়ী, তাবে-তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগে ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এই দুরূহ কাজ সম্পাদন করে গোটা মুসলিম জাতিকে সীরাতুল-মুস্তাকিমের পথে চলার সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এই ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তিনি কোরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে সাহাবা অনুসরণ করে ৮৩ হাজার মাসায়েল ইজতিহাদ প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে নামাযে রফে' ইয়াদাইন না করা, ইমামের পশ্চাতে মুকতাদীর কোরআন না পড়া, নামাযে আমীন চুপে চুপে বলা, নাভীর নিচে হাত বাঁধা, বিতির নামায তিন রাকআত, তারাবীহ এর নামায বিশ

রাকআত প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হানাফীগণ ইমাম আযমের সকল সিদ্ধান্ত বা রায় অনুসরণ করে যাচ্ছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে তথাকথিত 'আহলে হাদীস' নামে একটি সম্প্রদায় যাদেরকে সর্বসাধারণ হানাফীগণ লা-মাযহাবী বলে থাকেন, তারা উল্লিখিত মাসআলাসমূহের প্রতি কটাক্ষ ও বিরূপ সমালোচনা করে হানাফীদেরকে না হক ও বিদআতী বলে সাব্যস্ত করে থাকেন। ফলে আমাদের অনভিজ্ঞ ও সাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত হানাফীগণ বিভ্রান্তির বেড়াজালে পড়ে যান।

আমি এই সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে সর্বসাধারণ হানাফীদেরকে সচেতন ও অবহিত করার জন্য 'হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল' পুস্তকটি সম্পাদনা করেছি।

পুস্তকটির মধ্যে অতিরিক্ত 'ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে কিছু কথা' নিবন্ধটি যোগ করেছি। ইমাম আযম সম্পর্কে আহলে হাদীস সম্প্রদায় কটুক্তি ও বিষোদগার করে থাকেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। সর্বশেষ পুস্তকটির মধ্যে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপনপূর্বক পত্র সংযোজন করেছি।

পুস্তকটির ক্রুটি মোচন এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যে কজন ইসলামী শাস্ত্রে পণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটি নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁদের নিকট আমি চিরঋণী। এ ছাড়া যে সকল শ্রদ্ধাস্পদ ওলামায়ে কিরাম পুস্তকটিতে সংকলিত মাসায়েলসমূহ সমর্থন জ্ঞাপনপূর্বক দস্তখত করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

পুস্তকটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন, শ্যামনগর থানার বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব সরদার লিয়াকত আলী, আমি তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ব্যস্ততার মধ্যে পুস্তকটি সম্পাদনা করেছি বিধায় ক্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পরবর্তী সংস্করণে আল্লাহ চাহেন তো সংশোধনের আশা রাখি। আল্লাহপাকের নিকট দোআ করি, তিনি যেন আমাদের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে এবং মাযহাব ও তাকলীদবিরোধীদেরকে মাযহাবের রীতিনীতি যথাযথভাবে সম্পাদনের তৌফিক দিন। আমীন!

মা-আস্‌সালাম

সম্পাদক

এতে আছে

নামাযে রফে' ইয়াদাইন বা হস্ত উত্তোলন না করা প্রসঙ্গে

নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত। নামাযের মধ্যে অন্য সময় রফে' ইয়াদাইন বা হাত উঠানো জায়েয নয় (সুন্নাত নয়)। নিম্নে এর দলীল পেশ করা হলো ঃ

১। তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (একদিন উপস্থিত লোকদের) বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর নামাযের মত নামায পড়বো? অতঃপর তিনি নামায পড়লেন এবং প্রথমবার অর্থাৎ তাকবীর তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোন সময় হস্ত উত্তোলন করলেন না।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন, ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান, একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি করেছেন। কিন্তু ইমাম ও আলিমগণের অভিমত যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি (ইবনে মাসউদ) নবী করীম (সাঃ)-এর সফরে ও মুকীম হালতে সকাল-সন্ধ্যায় হার হামেশা দীর্ঘদিন তাঁর সংগে নামায আদায় করেছেন। তিনি ভুল করেছেন, এটা গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

২। বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের টীকায় উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ لِشَىْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) শুধু নামায শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাতেন। অতঃপর আর কোথাও (নামাযে) উঠাতেন না।[২]

৩। উপরোক্ত হাদীস গ্রন্থের টীকায় আরও উল্লেখ হয়েছে ঃ

اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زُبَيْرٍ رض رَاٰى رَجُلًا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَاْسِهٖ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَاِنَّ هٰذَا شَئٌ فَعَلَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهٗ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হতে মাথা উঠাবার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করতে দেখলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি এরূপ করিও না। কারণ, এটা এমন বিষয় যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) করেছিলেন, কিন্তু অতঃপর এটা পরিত্যাগ করেছেন।[৩]

৪। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, কী হলো? আমি তোমাদেরকে 'রফে ইয়াদাইন' করতে দেখছি। মনে হয় যেন তোমাদের হাতগুলো অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত (উঠাচ্ছো), তোমরা নামাযে এরূপ করিও না– ধীরস্থির থাকো।[৪]

৫। আবূ দাউদ ও তাহাবী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذَا كَبَّرَ لِاِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِّنْ شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

অর্থাৎ হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাতেন। পুনরায় আর উঠাতেন না।[৫]

৬। বায়হাকীতে আছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) নামাযের শুরুতে রফে' ইয়াদাইন করতেন। পুনরায় আর উঠাতেন না।[৬]

৭। তাহাবী শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنِ الْاَسْوَدِ رض قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

অর্থাৎ হযরত আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)কে প্রথমে রফে' ইয়াদাইন করতে দেখেছি। অতঃপর পুনরাবৃত্তি করেন নাই।[৭]

৮। তাহাবী এবং মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে যে,

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيَّ ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رض كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهَا فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ

অর্থাৎ হযরত আসেম ইবনে কুলাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, আমি হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ)কে ফরয নামাযের প্রথম তাকবীর ব্যতীত আর কোন সময় হাত উঠাতে দেখি নাই।[৮]

৯। বুখারী শরীফের শরাহ 'আইনী' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লেখা হয়েছে যে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ اَلْعَشَرَةُ الَّذِيْنَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ مَا كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اِلَّا فِى افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আশারায়ে মুবাশশারাহ– যাঁদেরকে নবী করীম (সাঃ) বেহেশ্তের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁরা নামায আরম্ভ করার সময় ব্যতীত দুই হাত উঠাতেন না। অর্থাৎ রফে' ইয়াদাইন করতেন না।[৯]

১০। 'মুতারজম মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ' গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে যে, হযরত হাম্মাদ ইবরাহীম নাখয়ী (তাবেয়ী) বলেছেন যে, তোমরা নামাযে তাকবীরে উলা ছাড়া অন্য কোন সময় হাত উঠাবে না।[১০]

১১। 'তানযীমুল আশ্তাত' নামক গ্রন্থে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ফখরুল মুহাদ্দেসীন হযরত মাওঃ ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী উল্লেখ করেছেন যে, ১ম যুগে মুসলমানদের রাজধানী ছিল মদীনায়। তখন সেখানে অনেক সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনে এযাম অবস্থান করতেন। মদীনাবাসীদের আমল দেখে ইমাম মালেক (রহঃ) শেষ জীবনে রফে' ইয়াদাইন ত্যাগ করেছিলেন। পরে যখন মদীনা হতে কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে গেল, তখন অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীগণ কুফায় চলে গেলেন। সেখানকার লোকেরা সাহাবা ও তাবেয়ীগণের আমল দেখে রফে' ইয়াদাইন করা ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন মদীনা ও কুফাবাসীগণ রফে' ইয়াদাইন করতেন না।[১১]

১২। তাহাবী শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ "হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন যে, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর পশ্চাতে নামায পড়েছি। তিনি শুধু প্রথম তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযের মধ্যে হাত উঠিয়েছেন। ইমাম তাহাবী বলেন যে, এই আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)ই রাসূল (সাঃ)কে প্রথমে রফে' ইয়াদাইন করতে দেখেছিলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালেল পর হযরত ইবনে উমর রফে' ইয়াদাইন পরিত্যাগ করেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (সাঃ)-এর এই আমলটি মনসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এই জন্যেই হযরত ইবনে উমর পরবর্তী সময়ে এই আমল পরিত্যাগ করেছিলেন।[১২]

১৩। নিহায়া ও কিফায়া কিতাবে বর্ণিত আছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ الْعَشَرَةَ الْمُبَشَّرَةَ مَا كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اِلَّا فِى افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছিলেন– যে দশজন সাহাবার বেহেশ্তী হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে, তাঁরা নামায আরম্ভ কালে একবার মাত্র রফে' ইয়াদাইন ব্যতীত তাঁদের হাত উঠাতেন না।

ইমাম তাহাবী ও আইনী প্রমাণ করেছেন যে, আবূ হুমায়দের রফে' ইয়াদাইনের হাদীস কয়েকটি কারণে যয়ীফ সাব্যস্ত হয়েছে। সে দশজন সাহাবা আবূ হুমায়দের সাক্ষাতে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের রফে' ইয়াদাইনের কথা প্রমাণিত হয় না। ইমাম বুখারী যে ১৭জন সাহাবার রফে' ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত উমর, হযরত আলী, ইবনে উমার, আবূ সাঈদ, ইবনে যোবায়ের রফে' ইয়াদাইন ত্যাগ করেছিলেন। ইমাম তাহাবী হযরত আনাস ও হযরত আবূ হুরায়রার হাদীস যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা জায়লাঈ হযরত আবূ সাঈদ, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে যোবায়ের ও হযরত আবূ হুরায়রার (রফে' ইয়াদাইন) হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। সুতরাং ইমাম বুখারীর রফে' ইয়াদাইনের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।[১৩]

১৪। হযরত মাওঃ রূহুল আমীন বসিরহাটী রচিত কামিউল মুবতাদেয়ীন ফী রদ্দে ছিয়ানাতুল মু'মিনীন গ্রন্থে লিখেছেন যে, "ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) -এর মতে রফে' ইয়াদাইনের হাদীস মনসূখ (রহিত) হয়েছে। এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত বারা' ইবনে আযেব, হযরত জাবের ইবনে সামরা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের মত। হযরত উমর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুম উক্ত রফে' ইয়াদাইন ত্যাগ করেছিলেন। কুফাবাসী মুহাদ্দিস, শ্রেষ্ঠ ইমাম সুফ্ইয়ান সওরী, ইবরাহীম নাখ্য়ী, ইবনে আবী লাইলা, আলকামা, আসওয়াদ, শা'বী, আবূ ইসহাক, খায়ছমা, মুগীরা প্রমুখ মহাবিদ্বানগণের এই অভিমত।[১৪]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, নামাযে তাকবীরে তাহ্রীমা ব্যতীত কোন রফে' ইয়াদাইন বা হস্ত উত্তোলন না করার প্রমাণ হাদীসে বিদ্যমান। সাহাবা ও তাবেয়ীগণের এক জামায়াতে হাত না উঠাবার মত প্রকাশ করেছেন। অতএব, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ নবী করীম (সাঃ)-এর আমল এবং হাদীস বর্ণনাকারীদের মতভেদের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং তবেয়ীগণের বর্ণনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে রফে' ইয়াদাইন না করার মত প্রকাশ করেছেন। আমরা হানাফীগণ এই মতের ওপর আমল করে থাকি। সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারত উপমহাদেশ তথা মুসলিমজাহানের স্বনামখ্যাত আলিম হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রগণ যাঁরা এই উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন তারা নামাযে রফে' ইয়াদাইন করেন নাই।

তথ্যসূত্র ঃ

১। তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ), পৃঃ-২৯২।
২। বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের টীকা, পৃঃ-১০২।
৩। প্রাগুক্ত।
৪। তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ) পৃঃ-২৯৪।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৯৩।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ-২৯২।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ-২৯৫।
৮। মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (উর্দূ), পৃঃ-৫৫ এবং তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ), পৃঃ-২৯৫।
৯। আইনী গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-৭।
১০। মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (উর্দূ), পৃঃ-৫৫।
১১। তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ), পৃঃ-২৯৬।
১২। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃঃ-৫৫।
১৩। সাইফুল মুকাল্লেদীন, প্রণেতা মাওঃ ইবরাহীম মহব্বতপুরী, পৃঃ-৩৫।
১৪। কামিউল মুবতাদেয়ীন, ৩য় খণ্ড, প্রণেতা-মাওঃ রুহুল আমীন বসিরহাটী।

ইমামের পশ্চাতে মুকতাদির কিরাআত না পড়া সম্পর্কে

'কিরাআত' শব্দের অর্থ পাঠ করা। নামাযের মধ্যে বিশেষ স্থানে পবিত্র কোরআন হতে কিছু অংশ পাঠ করাকে শরীআতের পরিভাষায় 'কিরাআত' বলা হয়। নামাযে কিরাআত পাঠ করা ফরয। কিরাআতের সর্বনিম্ন পরিমাণ ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত। নামাযী স্বীয় সংগতি অনুসারে কিরাআতকে দীর্ঘও করতে পারে। কিন্তু ইমামের পশ্চাতে মুকতাদি সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোন কিরাআত পড়বে না। বরং নামাযের ধ্যানে ইমামের কিরাআত শুনতে থাকবে অথবা চুপ করে থাকবে। সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ শুধু ইমামের দায়িত্ব। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে কোন অবস্থায়ই ইমামের পিছনে মুকতাদির সূরা ফাতিহা ও অন্য আয়াত তিলাওয়াত করা জরুরী নয়। নিচে এর প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হল ঃ

১। পবিত্র কোরআনের সূরা আ'রাফ-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা নিবিষ্ট চিত্তে শুনবে এবং চুপ করে থাকবে, যাতে তোমাদের ওপর রহমত হয়।[১]

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে যে, এই হুকুমটি কি নামাযের কোরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কোরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কোরআন পাঠের বেলায়, তা নামাযেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাস্‌সেরীনের মতে এই-ই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক।

কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল ব্যতীত যে কোন অবস্থায় কোরআন পাঠের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ ব্যাপক।

উল্লেখ্য যে, কতিপয় তাফসীরকার উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য পেশ করেছেন ঃ

০ ইমাম বাগাবী তাফসীরে মুয়াল্লেমুত্তানযীল-এ লিখেছেন যে, এক দল বিদ্বান বলেন– উপরোক্ত আয়াতটি নামাযের কিরাআতের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ইমামের পশ্চাতে কিরাআত নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য নাযিল হয়েছে।[২]

০ তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে, আলী ইবনে তানহা বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত আয়াতের অর্থ এই যে, যে সময় ফরয নামাযে কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, সে সময় তোমরা (মুকতাদিগণ) শ্রবণ কর ও নীরব থাক।[৩]

০ ইমাম মুজাহিদ বলেন, নবী করীম (সাঃ) নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন তাঁর পশ্চাতে আবূ আনসারী যুবক কোরআন পড়ছিলেন, সেই সময় উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।[৪]

০ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাফসীরে দুররে মানসুরে লিখেছেন– ইমাম আবূ বিন হুমাইদ ও ইমাম বায়হাকী কিরাআতের অধ্যায়ে হযরত আবূল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন– নবী করীম (সাঃ) যে সময় নামাযে কোরআন পাঠ করতেন সে সময় সাহাবাগণও (মুকতাদি) কোরআন পড়তেন, সেহেতু উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল। তৎপরে নবী করীম (সাঃ) নামাযে কিরাআত পাঠ করতেন, কিন্তু মুকতাদি সাহাবাগণ কিরাআত পাঠ করতেন না।

০ এ ছাড়া সাঈদ বিন মুসাইয়েব, মুহাম্মাদ বিন কা'ব জুহুরী, ইবরাহীম, হাসান বলেন, উক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।[৬]

২। 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' হাদীস গ্রন্থ হতে সংগৃহিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَاءَ مَعِىْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَالِىْ اُنَازِعُ فِى الْقُرْاٰنِ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا جَهَرَ فِيْهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰالِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىْ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوٰى اِبْنُ مَاجَهْ نَحْوَهٗ ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ এক নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন যাতে তিনি জেহরী (আওয়াজ)

কিরাআত পড়েছিলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদর মধ্যে কি কেউ এখন আমার সাথে কিরাআত পড়েছ? একব্যক্তি উত্তর করল ঃ জ্বি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি নামাযে মনে মনে বলতেছিলাম আমার কী হল, কোরআন পড়তে আমি এরূপ টানা হেঁচড়া অনুভব করতেছি কেন? আবূ হুরায়রা বলেন, যখন লোকেরা রাসূল (সাঃ)-এর মুখে এটা শুনল, তখন হতে তারা জেহরী নামাযে (ইমামের পিছনে) কিরাআত পড়া হতে বিরত হয়ে গেল। মালেক, আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৭]

ইমাম আযম আবূ হানীফার (রহঃ) মতে এই হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার সমস্ত হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে।

৩। মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قُرِءَ فَانْصِتُوْا ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ইমাম এজন্যই নির্ধারিত হয়েছেন যাতে তাঁর অনুসরণ করা হয়। সুতরাং যখন ইমাম আল্লাহু আকবার বলবে তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে এবং যখন তিনি কোরআন পড়বেন তোমরা চুপ থাকবে।[৮]

৪। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ও শরহে মাআনিউল আছার গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ

অর্থাৎ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পশ্চাতে নামায পড়ে, ইমামের কিরাআত তার (মুক্তাদি) কিরাআত বলে গণ্য হবে।[৯]

৫। মুসলিম শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض وَقَتَادَةَ رض اِذَا قُرِاَء فَاَنْصِتُوْا

হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন (ইমাম) কিরাআত পড়ছেন, তখন তোমরা (মুকতাদি) চুপ থাকবে।[১০]

এতে মুকতাদিগণের পক্ষে কিরাআত পাঠ করা ঠিক নয়।

৬। দারে কুত্নী গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنِ الشَّعْبِىْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

হযরত শা'বী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদির কোন কিরাআত নাই।[১১]

৭। উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أُنْصِتُ قَالَ بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)কে বললেন, আমি কি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ব, না চুপ থাকব? নবী করীম (সাঃ) বললেন, চুপ থাকবে। কেননা ইমামের কিরাআতই তোমার জন্যে যথেষ্ট।[১২]

৮। মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَعَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ

অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ইমামের পিছনে নামায পড়ে, তখন ইমামের কিরাআত তার জন্য যথেষ্ট। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) নিজেই ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন না।[১৩]

৯। তাহাবীতে আছে ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ بِالتُّرَابِ

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে থাকে, তার মুখ যদি মাটি দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হত (তবে ভালই হত)।[১৪]

১০। 'মুস্নাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা' হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত আছে ঃ

اِنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهْرِ اَوِالْعَصْرِ وَاَوْمَأَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَتَنْهَانِىْ اَنْ اَقْرَءَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرَا ذٰلِكَ حَتّٰى سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صلعم مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْإِمَامِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ ـ

এক রেওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে যোহর অথবা আসর নামাযে কিরাআত পাঠ করে, তখন এক ব্যক্তি ইংগিতে এটা পড়তে নিষেধ করে। যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন তখন বললেন ঃ তুমি কি আমাকে নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে নামায পড়া থেকে বাধা প্রদান করছ? অতঃপর উভয়ে এটা নিয়ে তর্ক করতে লাগল। এমনকি নবী করীম (সাঃ) এটা শুনে ফেললেন, তখন তিনি বললেন– যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়বে এই অবস্থায় ইমামের কিরাআত তার কিরাআত হবে। অর্থাৎ মুকতাদি হিসেবে তার কিরাআত পড়তে হবে না।[১৫]

১১। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَاَنْصِتُوْا قَدْ صَحَّحَهٗ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَمُنْذِرٌ وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوٰى اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ تَيْمِيَةَ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ মূসা (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ ইমাম যখন কোরআন পড়বে, তোমরা চুপ করে থাকবে। ইমাম মুসলিম, ইমাম আহ্মদ, ইমাম ইবনে জারীব, ইমাম মুনযির ও ইমাম ইবনে হাযেম উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ বা সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আবদুল বার ও ইবনে তাইমিয়া এই হাদীস স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন।[১৬]

১২। 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে ঃ

قَالَ عَلِيٌّ رض مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ اَخْطَأَ الْفِطْرَةَ

অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পশ্চাতে কিরাআত পড়ে, সে যেন (দ্বীনের কাজে) ভুল করল।[১৭]

১৩। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ جَابِرٍ رض يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ التِّرْمِذِىْ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

অর্থাৎ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পড়ল, তার নামায হয় নাই। কিন্তু ইমামের পশ্চাতে নামায পড়লে তার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করার প্রয়োজন নাই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসকে হাসান সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন।[১৮]

১৪। সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ

سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رض عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِىْ شَيْءٍ

কোন ব্যক্তি হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন– ইমামের পশ্চাতে কোরআন পড়তে আছে কিনা? তদুত্তরে তিনি বললেন, ইমামের পশ্চাতে (মুকতাদিদেরকে) কোন নামাযেই কোরআন পড়তে হবে না।[১৯]

১৫। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ رض وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ يَعْنِىْ وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا فَقَالَ هُوَ عِنْدِىْ صَحِيْحٌ -

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ ইমাম যে সময় কোরআন পাঠ করেন, তোমরা (মুকতাদিগণ) চুপ করে থাক। ইমাম মুসলিম বলেন, এই হাদীসটি আমার নিকট সহীহ্ বা বিশুদ্ধ।[২০]

১৬। 'ফতহুল কাদীর' কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে,

عَنْ مُجَاهِدٍ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ يَقْرَاُ فِى الصَّلٰوةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَنَزَلَ وَاِذَا قُرِاَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا -

অর্থাৎ ইমাম মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) নামাযে কোরআন পাঠ অবস্থায় (তাঁর পশ্চাতে) জনৈক আনসারী (মদীনাবাসী) যুবককে কোরআন পড়তে শুনলেন, সে সময় উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল। যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা নিবিষ্ট চিত্তে শুনবে এবং (সর্বদা) চুপ থাকবে।[২১]

১৭। উক্ত কিতাবে আরও উদ্ধৃত হয়েছে যে, ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন ঃ আলিমগণের এজমা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি নামাযের সম্বন্ধেই নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ মুকতাদিগণকে ইমামের কোরআন পাঠের সময় নীরব থাকার জন্য নাযিল হয়েছে।[২২]

১৮। আবূ দাউদ শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُّصَلِّىْ وَحْدَهٗ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং অন্য কিছু না পড়ে, তার নামায হবে না। ইমাম সুফইয়ান বলেন, এটা যিনি একাকী নামায পড়েন তার জন্য।[২৩]

১৯। মুওয়াত্তায়ে মালেক হাদীস গ্রন্থে আছে ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا وَرَاءَ الْاِمَامِ ـ

অর্থাৎ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাকআত নামায পড়ল; এতে সূরা ফাতিহা পড়লো না, সে যেন নামায পড়ল না। কিন্তু ইমামের পশ্চাতে মুকতাদিগণকে পাঠ করতে হবে না।[২৪]

২০। হযরত আবূদ্দারদা (রাঃ) হতে নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

فَقَالَ مَا اَرٰى الْاِمَامَ اِذَا اَمَّ الْاِمَامُ اِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

আমি বিশ্বাস করি– ইমাম কিরাআত পড়লে মুকতাদিগণের কিরাআত পড়া হয়ে যাবে।[২৫]

২১। নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلّٰى صَلٰوةَ الظُّهْرِ اَوِالْعَصْرِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا وَلَمْ اُرِيْدُ بِهَا اِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيْهَا ـ

অর্থাৎ ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই হযরত নবী করীম (সাঃ) যোহর ও আসর পড়েছিলেন এবং এক ব্যক্তি তাঁর পশ্চাতে কোরআন পড়েছিলেন। নবী করীম (সাঃ) নামায শেষ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সূরা 'আলা' পাঠ করেছো? ঐ দলের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন– আমিই পড়েছি। কিন্তু সদুদ্দেশ্যেই পড়েছি। এতে নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কিরাআতের মধ্যে বিঘ্ন ঘটিয়েছ।[২৬]

উক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম চুপে চুপে কিরাআত পড়লেও মুকতাদিও কোন কিরাআত পাঠ করবে না। ঠিক তেমনি জাহরিয়া নামাযে যেমন

মাগরিব, এশা ও ফজরে মুকতাদি কিরাআত পড়বে না। এই মর্মে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২২। হাফেযে হাদীস মাওঃ আবদুর রশীদ গাংগুহী বলেন ঃ ইমামের পিছনে মুকতাদির কিরাআত পাঠ করা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। পরবর্তী সময় وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ...... এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর উক্ত বিধান রহিত হয়ে গেছে।[২৭]

২৩। বুখারী শরীফের শরাহ ফয়যুল বারীতে আছে, ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) ইনতিকালের পূর্বে তিন দিন পর্যন্ত তিনি জামাআতে যাওয়া হতে বিরত ছিলেন। উক্ত সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ) জাহরী নামাযের ইমামতি করছিলেন। হুযূর (সাঃ) যখন মসজিদে আগমন করলেন তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) নামাযের মধ্যেই পশ্চাতে গেলেন। নবী করীম (সাঃ) ইমামতির জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) যে পর্যন্ত কিরাআত পড়তেছিলেন, সেখান থেকে কিরাআত পাঠ করা শুরু করেন। উক্ত অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) সূরা ফাতিহা দোহ্‌রান নাই। যদি সূরা ফাতিহা পাঠ রুকন হত যা পাঠ না করলে নামায হয় না, তবে হুযূর (সাঃ) সূরা ফাতিহা অবশ্যই দোহরাতেন। হুযূর (সাঃ) শেষ জীবনে 'ফাতিহা' ছাড়া নামায কেমন করে পড়লেন? তাঁর জীবনে শেষ আমলের দ্বারা জানা গেল যে, সূরা ফাতিহা ইমামই পাঠ করবেন। ইমামের কিরাআত পাঠ অর্থ মুকতাদির কিরাআত পাঠ করা। সুতরাং কিরাআত পাঠ ইমামের পিছনে মুকতাদির জন্য জরুরী নয়। কিরাআত পাঠের হুকুম মনসূখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে। সেহেতু যদি কেউ ইমামকে ফাতিহা পাঠের পরে পায় বা রুকূতে পায়, তখন সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা কিভাবে পড়বে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের পিছনে মুকতাদির কিরাআতের প্রযোজন নেই।[২৮]

২৪। যুক্তিতর্কেও বুঝা যায় যে, ইমাম সমস্ত মুকতাদির পক্ষ হতে উকিল। সূরা ফাতিহা খোদার শিখানো দরখাস্ত, যা ইমাম সাহেব সকলের পক্ষ হতে প্রভুর দরবারে আবেদন-নিবেদন করে থাকেন। দরখাস্তে (সূরা ফাতিহা) শেষ হয়ে গেলে সকলেই আমীন বলে থাকেন। যেমন বাদী-বিবাদীর পক্ষ হতে হাকীমের (বিচারক) নিকটে একজন উকিল বর্ণনা দিয়ে থাকেন। উকিলের কথাই সকলের কথা। হাকীমের সম্মুখে প্রত্যেকে বর্ণনা দেন না বরং উকিলই দিয়ে থাকেন। অনুরূপ ইমাম সাহেব মাত্র একাই সকলের পক্ষ হতে প্রভুর কাছে দরখাস্ত পেশ করেন। মুকতাদিগণ নয়।

পবিত্র কোরআনে ও বর্ণিত হাদীসসমূহের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কিরাআত ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার দায়িত্ব ইমাম-এর। কিন্তু একাকী নামায পড়লে সূরা ফাতিহা ও কিরাআত উভয়ই পড়তে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে উচ্চস্বরের নামায হোক যেমন ফজর, মাগরিব, ইশা ও জুমআ এবং নিম্নস্বরের নামায যেমন যোহর ও আসর কোন অবস্থাতেই ইমামের পশ্চাতে মুকতাদির সূরা ফাতিহা ও কিরাআত পড়তে হবে না। একই মত পোষণ করেছেন হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ, হযরত জায়েদ বিন সাবিত, হযরত আলী বিন আবূ তালিব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত সুফইয়ান সওরী, হযরত সুফইয়ান ইবনে উয়ায়াইনা, ইবনে আবি লাইলা, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ খুদরী, হাসান বিন সালেহ ও ইবরাহীম নাখয়ী প্রমুখ সাহাবা ও তাবিয়ীগণ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন ঃ প্রথম যুগের মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাদের ৮০ জন ইমামের পশ্চাতে কিরাআত পাঠ না করার পক্ষ সমর্থন করেছেন।[২৯]

উপরের বর্ণনাসমূহের দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, হানাফীগণ ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা ও কিরাআত না পড়ার সিদ্ধান্ত কোন মনগড়া খেয়াল খুশীমত করেন নাই। বরং পবিত্র কোরআন, হাদীস, তাফসীর অনুযায়ী ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা বা আয়াত না পড়ার আমল করে থাকেন। তবে উল্লেখ্য যে, ইমামের কিরাআতের শব্দ কর্ণগোচর হলে মুকতাদি তা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করবে। কিরাআতের শব্দ শুনতে পাওয়া না গেলে মুকতাদি শুধু চুপ বা নীরব থেকে নামাযের ধ্যানে দাঁড়িয়ে থাকবে। হানাফী ইমাম ও ফকীহগণের এটাই সিদ্ধান্ত।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং ২০৪।

২। সাইফুল মুকাল্লেদীন, কৃত মাওঃ ইবরাহীম মুহাব্বাতপুরী, পৃঃ-৩৯।

এবং তুহ্ফাতুল মু'মিনীন, কৃত মাওঃ শামসুদ্দীন মোহনপুরী, পৃঃ-৮৪।

৩। তুহফাতুল মু'মিনীন, পৃঃ-৮৫।

৪। প্রাগুক্ত।

৫। তুহফাতুল মু'মিনীন, কৃত মাওঃ শামসুদ্দীন মোহনপুরী, পৃঃ-৮৫।

৬। তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ), পৃঃ- ৩১২।

৭। মিশকাত শরীফ, নামায পর্ব, হাদীস নং ৭৯৫।
৮। তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড, ৩১৫, পৃঃ- ৩৭৪-৩৭৫।
৯। ইবনে মাজা, পৃঃ-৭১; তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৩১৭ এবং মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ (উর্দূ), পৃঃ-৫৯।
১০। সহীহ মুসলিম, পৃঃ-১৭৪।
১১। তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ), পৃঃ-৩১৯।
১২। প্রাগুক্ত।
১৩। মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ (উর্দূ), পৃঃ-৫৬।
১৪। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ-৪৬ এবং তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ), পৃঃ-৩২১।
১৫। মুসনাদে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা, হাদীস নং ১০৪।
১৬। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ-৪৪।
১৭। তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ), পৃঃ-৩১২।
১৮। তিরমিযী, পৃঃ-৪২ এবং মুওয়াত্তায়ে মালেক, পৃঃ-২৮।
১৯। সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ-২১৫।
২০। সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৭৪।
২১। ফতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৩৭।
২২। ফতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৩৭।
২৩। আবূ দাউদ শরীফ, পৃঃ-১৪৬।
২৪। মুওয়াত্তায়ে মালেক, পৃঃ-২৮ এবং সাইফুল মুকাল্লেদীন, কৃত মাওঃ ইবরাহীম মুহাব্বাতপুরী, পৃঃ-৬২।
২৫। নাসায়ী শরীফ, পৃঃ-২৪৬।
২৬। প্রাগুক্ত।
২৭। তানযীমুল আশতাত, ১ম খণ্ড (উর্দূ), পৃঃ-৩২৯।
২৮। ফয়যুল বারী।
২৯। বংগানুবাদ মুসনাদে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা, পৃঃ-১৩৯।

নামাযে হাত কোথায় বাঁধবে

তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর পুরুষ নাভীর নিচে আর মহিলা বুকের বা সিনার উপর ডান হাতের 'কর' বাম হাতের করের উপর স্থাপন করবে। পুরুষ কোন অবস্থায়ই সিনার উপর হাত বাঁধবে না। কথিত আহ্‌লে-হাদীস সম্প্রদায় মহিলাদের ন্যায় সিনার উপর হাত বেঁধে নামায পড়ে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম সুফইয়ান সওরী ও ইমাম ইসহাক প্রমুখ বলেন যে, পুরুষের জন্য নাভীর নিচে ও মহিলার জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত। এর খেলাফ করলে নামায মাকরূহ হবে। নিচে প্রমাণাদি পেশ করা হল ঃ

১। আবূ দাউদ শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ رض قَالَ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اَخْذُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ـ

হযরত আবূ ওয়াইল হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, নামাযের মধ্যে এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করবে।[১]

২। দারে কুতনী, বায়হাকী ও আবূ দাউদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّوَوِىْ فِىْ شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِىٍّ رض قَالَ مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلٰوةِ وَضْعُ الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ

অর্থাৎ আল্লামা ইমাম নববী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ নামাযের মধ্যে নাভীর নিচে হাত স্থাপন করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[২]

৩। হিদায়া গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৮৬ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ ডান হাত-বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

৪। তিরমিযী শরীফে আছে ঃ

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَاْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ -

অর্থ- হযরত কাবীসা ইবনে হলব তাঁর পিতা হলব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আমাদের ইমামতি করতেন, তখন তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাম ধরতেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন, সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তবে হাত রাখার ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। যেমন কেউ কেউ উভয় হাত নাভীর উপর স্থাপন করার অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ নাভীর নিচে স্থাপন করার অভিমত দিয়েছেন। আলিমগণের নিকট এই উভয় নিয়মের অবকাশ রয়েছে।[৪]

৫। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর কিতাবুল আ-ছারে আছে- নবী করীম (সাঃ) নাভীর নিচে বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের তালু রাখতেন।[৫]

৬। সহীহ আবূ দাউদে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ নাভীর নিচে এক হাত অন্য হাতের উপর রাখা নামাযের সুন্নাত।[৬]

৭। আওজাযুল মাসালিক নামক কিতাবে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ ثَلٰثٌ مِّنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ تَعْجِيْلُ الْاِفْطَارِ وَ تَاخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

অর্থ- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তিনটি নবীদের আখলাকী কাজ বা আদর্শ। যথা ঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার পরই ইফতার করা, সাহ্‌রী দেরী করে খাওয়া, আর তৃতীয় নামাযের মধ্যে নাভীর নিচে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নামায আদায় করা।[৭]

৮। উক্ত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ

অর্থ– হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ নাভীর নিচে ডান হাতের পাঞ্জাকে বাম হাতের উপর রেখে নামায আদায় করা সঠিক নিয়ম।[৮]

৯। মসনদে ইবনে আবি শায়বা হাদীস গ্রন্থে লিখিত আছে যে,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ اَبِيْهِ رض قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّمْ يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهٖ تَحْتَ السُّرَّةِ .

হযরত ওয়াসেল (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)কে নাভীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধতে দেখেছি।

আল্লামা আবূ তাইয়েব মাদানী বলেছেন, মসনদে ইবনে আবি শায়বার হাদীসটি সহীহ্; সনদ অতি সহীহ্। এটাই হানাফী মাযহাবের দলীল।

১০। عَنْ اَبِىْ حُذَيْفَةَ رض اَنَّ عَلِيًّا قَالَ اَلسُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ وَلْيَضَعْهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ নামাযের মধ্যে হাত বাঁধা সুন্নাত এবং দুই হাত নাভীর নিচে স্থাপন করবে।[১০]

১১। সহীহ মুসলিমের টীকায় উল্লেখ হয়েছে যে, ইমাম শাফিয়ীর প্রসিদ্ধ মতে ও অধিকাংশ আলিমের মতে দুই হাত বুকের নিচে নাভীর উপর রাখবে। ইমাম আবূ হানীফা, সুফইয়ান সওরী, ইসহাক ও আবূ ইসহাকের মতে নাভীর নিচে দুই হাত রাখবে এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হতে দুই প্রকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ এক মতে বলেন, বুকের নিচে নাভীর উপরে হাত বাঁধবে। আর এক মতে বলেন– নাভীর নিচে হাত রাখবে।

উল্লেখ্য যে, পুরুষ লোকের হাত বাঁধবার ব্যবস্থা হাদীস ও সাহাবাগণের পথ মত হতে প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে এতদ্সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই। কাজেই ইমাম আযম কিয়াস করে বলেছেন যে, স্ত্রীলোকেরা নামাযে দুই হাত বুকের উপর বাঁধবে। এটাতে তাদের পর্দা রক্ষা হবে– কাপড় খুলতে পারবে না।[১১]

১২। উলূমুল হাদীস গ্রন্থে ইবনে ছালা লিখেছেন ঃ

زَادَ اِبْنُ خُذَيْمَةَ عَلٰى صَدْرِهٖ وَلَمْ يَثْبُتْ

অর্থাৎ খোযায়মা 'বুকের উপর হাত রাখা' এই কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সেটা প্রমাণিত নয়।[১২]

অকুদোল জওয়াহের গ্রন্থে বর্ণিত আছে– নবী করীম (সাঃ) নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছিলেন, এটাই সহীহ; কিন্তু 'বুকের উপর হাত রাখা' কথাটি সহীহ্ নয়।[১৩]

উপরোক্ত দলীলসমূহের দ্বারা প্রতিভাত হল যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণের নামাযে নাভীর নিচে হাত রাখার সিদ্ধান্ত খেয়াল-খুশী মত নয় বরং সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং পুরুষগণ বুকের উপর হাত না রেখে নাভীর নিচে হাত রেখে নামায পড়তে পারেন, তজ্জন্য আল্লাহপাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন!

তথ্য সূত্র ঃ

১। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, কৃত ই,ফা,বা, পৃঃ–৫২।

২। প্রাগুক্ত।

৩। হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ–৮৬।

৪। জামে তিরমিযী শরীফ, মুতারজম উর্দু, পৃঃ– ১৭০।

৫। তুহ্ফাতুল মু'মিনীন, কৃত মাওঃ শামসুদ্দীন মোহনপুরী, পৃঃ–৭৮।

৬। আবূ দাউদ শরীফ, পৃঃ– ১১১।

৭। আওজাযুল মাসালিক, ১ম খণ্ড, পৃঃ–১১৯।

৮। প্রাগুক্ত।

৯। সাইফুল মুকছেদীন, মাওঃ মুহাব্বাতপুরী।

১০। রাযীন (হাদীস গ্রন্থ), পৃঃ– ২১৬।

১১। তুহ্ফাতুল মু'মিনীন, মাওঃ শামসুদ্দীন মোহনপুরী, পৃঃ–৭৯-৮০।

১২। সাইফুল মুকাল্লেদীন, কৃত মাওঃ ইবরাহীম মুহাব্বাতপুরী, পৃঃ–১২৩।

১৩। প্রাগুক্ত।

'আমীন' চুপে বলা প্রসংগে

নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা সুন্নাত। চার ইমাম ও অন্যান্য ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ এতে একমত। হানাফী মাযহাবে চুপে চুপে পড়ার নামায হোক অথবা উচ্চস্বরে পড়ার নামায হোক– ইমাম ও মুকতাদি অথবা একাকী হোক সর্বাবস্থায় 'আমীন' চুপে বলতে হবে। এর কতিপয় দলীল লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

১। বুখারী ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ اِبْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اٰمِيْنْ ـ

অর্থ– হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, যার 'আমীন' বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে যুগপৎভাবে একযোগে হবে, তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বলেছেন, আল্লাহর রাসূলও আমীন বলতেন।[১]

২। তিরমিযী শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ

অর্থ– হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ ... পাঠের পর আমীন বলতে শুনেছি। আর তিনি তা বলার সময় নিজ আওয়ায দীর্ঘ করেন।[২]

৩। উক্ত সাহাবী আরও বর্ণনা করেন ঃ

خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ اِنَّمَا هُوَ وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ

অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) وَلَا الضَّالِّيْنَ পাঠের পর আস্তে এবং তা দীর্ঘস্বরে (উচ্চস্বরে নয়) অর্থাৎ– নিজের কানে নিজে যেন স্পষ্ট শুনতে পায়।[৩]

৪। তিরমিযীতে আরও উল্লেখ আছে ঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

অর্থ ঃ হযরত আলকামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– নবী করীম (সাঃ) গায়রিল ... ওয়ালাদদাল্লীন বলার পর 'আমীন' বলেছেন এবং আমীন নিচু স্বরে চুপে চুপে বলেছেন।[৪]

ইমাম আহমদ, আবূ ইয়ালা, ইমাম তাবরানী, দারে কুতনী ও হাকিম মুস্তাদরাক নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলকামা (রাঃ)-এর পিতা হযরত ওয়াইল (রাঃ) রাসূলে করীমের সাথে নামায আদায় করেছেন। যখন রাসূলে করীম (সাঃ) গায়রিল মাগদুবি আ'লাইহিম ... পর্যন্ত পৌছেছেন, তখন তিনি চুপে চুপে আমীন বলতেন।[৫]

৫। বুখারীর শরাহ 'আইনী' গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ اَلتَّعَوُّذُ وَالْبَسْمَلَةُ وَسُبْحَانَكَ وَاٰمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হযরত ইবরাহীম নাখ্য়ী হতে বর্ণিত আছে– ইমাম চারটি দোয়া চুপে চুপে বলবে– আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সুবাহানাকা ও আমীন।[৬]

(৬) وَرَوَى الطَّبَرَانِىُّ فِىْ تَهْذِيْبِ الْاٰثَارِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ رض قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ رض وَعَلِىٌّ رض يَجْهَرَانِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا اٰمِيْنَ ـ

অর্থ– হযরত তাবারানী 'তাহযীবুল আছার' গ্রন্থে হযরত আবূ ওয়াইল হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) তাঁরা কেউই আমীন ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম স্বশব্দে বলতেন না।[৭]

৭। তাফসীরে কবীরের ৪র্থ খণ্ডে ২৪৩ পৃষ্ঠায় ইমাম রাযী বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, 'আমীন' চুপে চুপে পাঠ করা উত্তম। আর ইমাম শাফিয়ী বলেন, আমীন উচ্চস্বরে পাঠ করা উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা নিজ মতের সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এই দলীল পেশ করেছেন যে, আমীন শব্দে দুই প্রকার মত আছে– ১ম এই যে, সেটা একটি দোয়া, ২য়, সেটা আল্লাহ পাকের একটি নাম। যদি আমীন দোয়া হয়, **তবে সেটা চুপে চুপে পাঠ করা ওয়াজিব হবে**। কেননা আল্লাহপাক বলেছেন– "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতরভাবে ও চুপে চুপে দোয়া কর।"

আর যদি আমীন আল্লাহপাকের একটি নাম হয়, **তবে সেটা চুপে চুপে পাঠ করা ওয়াজিব হবে**। কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন, "তুমি তোমার প্রতিপালককে, মনে মনে কাতর ও ভীতভাবে ও অনুচ্চস্বরে স্মরণ কর। আর যদি তা চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব না হয়, তবে অন্তত পক্ষে সেটা মুস্তাহাব হবে। আমরা এই মত অবলম্বন করি।[৮]

৮। ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজা হযরত ছামুরা বিন জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি (ছামুরা বিন জুনদাব) হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে দুটি (অর্থাৎ দুই স্থানে) চুপ থাকবার কথা স্মরণ রেখেছেন। ১ম যে সময় তিনি তাকবীর তাহরীমা অন্তে চুপে চুপে 'ছানা' পড়তেন। ২য় যখন তিনি সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতেন, তখন 'আমীন' চুপে চুপে পড়তেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এই হাদীসটিকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। ইমাম দারেমীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৯]

৯। শাফিয়ী মতাবলম্বী ইমাম তিবি বলেছেন, উপরোক্ত হাদীসে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) প্রথমবার 'ছানা' পাঠ করার সময় চুপ করতেন এবং দ্বিতীয়বার আমীন চুপে চুপে বলতেন।– মিরকাত দ্রঃ।[১০]

১০। আবূ দাউদ তায়ালছীতে উল্লেখ আছে ঃ

فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنْ وَاَخْفٰى بِهَا صَوْتَهٗ ـ

অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) ফাতিহা শেষ করে চুপে চুপে আমীন পাঠ করতেন।[১১]

১১। তাহাবী, ইবনে শাহীম ও ইবনে জরীর তাবারীতে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ لَا يَجْهَرَانِ بِالْبَسْمَلَةِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّامِيْنِ ـ

হযরত আবূ ওয়াইল বলেন ঃ হযরত উমর ও হযরত আলী বিসমিল্লাহ, আউজু ও আমীন চুপে চুপে পাঠ করতেন।[১২]

১২। নিশ্চয়ই নবী করীম (সাঃ) সূরা ফাতিহা শেষ করে চুপে চুপে আমীন পড়েছিলেন।[১৩]

'শরহে বিকায়া' দ্রঃ।

অতএব উল্লেখিত সহীহ হাদীস দৃষ্টে হানাফীগণ চুপে চুপে আমীন বলে থাকেন। উপমহাদেশের সকল মুহাক্কিক আলিম ও মুফতীগণ এই আমল করে আসছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, কৃত ই,ফা,বা, পৃঃ–৪৯।

২। জামে তিরমিযী মুতারজম উর্দূ, ১ম খণ্ড, পৃঃ–১৬৯।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ–১৬৯।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ–১৬৯।

৫। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ–৫০।

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ–৫১

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ–৫১

৮। সাইফুল মুকাল্লেদীন, কৃত মাওঃ ইবরাহীম মুহাব্বাতপুরী, পৃঃ–৯৯-১০০।

৯। তুহফাতুল মুমিনীন, কৃত মাওঃ শামসুদ্দীন মোহনপুরী, পৃঃ–৯৯।

১০। প্রাগুক্ত।

১১। সাইফুল মুকাল্লেদীন, কৃত মাওঃ ইবরাহীম মুহাব্বাতপুরী, পৃঃ–৮৫।

১২। প্রাগুক্ত।

১৩। শরহে বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ–১৬৭।

বিতর নামায

এক রাকআত নয়– তিন রাকআত

বিতর নামায তিন রাকআত। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে এটা ওয়াজিব। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে বিত্‌রের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এই ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ীর তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথমটি হল, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অনুরূপ। দ্বিতীয়টি হল, দুই সালামে তিন রাকআত। দুই রাকআত পড়ার পর তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে। অতঃপর এক রাকআত পড়ে তাশাহ্‌হুদ এবং সালাম ফিরাতে হবে। তৃতীয়টি হল, ইচ্ছা করলে এক সালামে তিন রাকআতও পড়তে পারে অথবা শুধু এক রাকআতও পড়তে পারে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারীগণ বিতর নামায এক সালামে তিন রাকআত পড়ে থাকেন। এটাই অধিক সহীহ হাদীসসম্মত। প্রমাণস্বরূপ নিচে কিছু সহীহ্ হাদীস পেশ করা হল ঃ

১। 'মুসনাদে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা' হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلٰوةً وَهِيَ وِتْرٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ إِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَزَادَكُمُ الْوِتْرَ - وَفِيْ رِوَايَةٍ إِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلٰوةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَحَافِظُوْا عَلَيْهَا -

আনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর ফরয নামাযের পর আরও এক নামায অতিরিক্ত করে দিয়েছেন, তা হল বিতর।' অপর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তোমাদের ওপর নামায ফরয করেছেন এবং অতিরিক্ত করে দিয়েছেন বিতর। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নামায অতিরিক্ত করেছেন, তা হল 'বিতর'। সুতরাং এর হিফাযত কর।[১]

হযরত ইমাম আ'যম থেকে বিতর সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তিনি 'বিতর'কে ফরয, ওয়াজিব অথবা সুন্নাত মনে করতেন। তবে ওয়াজিব হওয়ার রেওয়ায়েত অধিক সহীহ। কেননা, হাদীসে زَادَكُمْ শব্দ রয়েছে। এতে 'বিতর' সুন্নাত না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। বরং এর দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। কেননা অতিরিক্ত زَادَكُمْ হওয়ার ইংগিত আল্লাহর দিকে করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ)-এর দিকে নয়। সুতরাং এটা সুন্নাত নয়। আর ফরয এই জন্য নয় যে, উপরোক্ত হাদীস অকাট্য দলীল دَلِيْل قَطْعِىْ নয়।

সুতরাং ফরয ও সুন্নাতের মধ্যবর্তী একটি হবে, সেটা হল ওয়াজিব। এখানে ফরযের উপর বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে ফরয হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এর জন্য دَلِيْل قَطْعِىْ না থাকায় ওয়াজিব হয়েছে। হযরত আবূ আইউব আনসারী হতে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস 'বিতর' ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ 'বিতর' আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর হক বা কর্তব্য। হক এর আদায় যেহেতু ওয়াজিব। সুতরাং এর দ্বারাও বিতর ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হয়। উক্ত হাদীস গ্রন্থে ইবনে বারীদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا যে বিতর আদায় করে না, সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়। হাদীসে এই বাক্যটি তিনবার উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং এইরূপ কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা বিতর ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণিত করে। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে اَوْتِرُوْا শব্দ বর্ণিত আছে, যা ওয়াজিব হওয়ার কথা প্রমাণ করে।[২]

ইমাম বাজজার আসওয়াদ হতে, তিনি আবদুল্লাহ হতে, তিনি নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বিতরের নামায প্রতিটি মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। নবী করীম (সাঃ), সকল সাহাবা, তাবিয়ীন ও তাবে তাবিয়ীন তা পাঠ করেছেন। অতএব, এটা সুন্নাত নয়– ওয়াজিব। –নূরুল হিদায়া দ্রঃ।[৩]

শরহে বিদায়ায় আছে– বিতরের নামায ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফার মতে এটা ফউত হলে কাযা করা এজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।[৪]

২। সহীহ তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ اٰخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সাঃ) বিতর (নামায) তিন রাকআত পড়তেন। তিনি প্রত্যেক রাকআতে তিনটি সূরা পড়তেন। সর্বশেষ সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়তেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন, কতক সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণ তিন রাকআত বিতর পড়তেন। ইমাম সুফইয়ান সওরী বলেন, "তোমরা ইচ্ছা করলে পাঁচ রাকআত অথবা তিন রাকআত অথবা এক রাকআত পড়তে পার। কিন্তু আমি বিতর নামায তিন রাকআত পড়াই পছন্দ করি।" ইমাম ইবনে মুবারক এবং কুফাবাসীগণের এটাই অভিমত।[৫]

৩। عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا فِىْ اٰخِرِهِنَّ ـ (نسائى)

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (সাঃ) বিতর নামায তিন রাকআত পড়তেন। তিন রাকআত শেষ করে তিনি সালাম ফিরাতেন। (নাসায়ী)[৬]

৪। নাসায়ী ও তাহাবী শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْوِتْرِ ـ

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) বিতরের দুই রাকআতে সালাম ফিরাতেন না। অর্থাৎ এক সংগে তিন রাকআত পড়ে সালাম ফিরাতেন।[৭]

৫। 'মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ' নামক হাদীসের কিতাবে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَلْوِتْرُ ثَلٰثٌ كَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন– বিতর মাগরিবের ন্যায় তিন রাকআত।[৮]

৬। 'মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ'-এর অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلْوِتْرُ كَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বিতর মাগরিবের নামাযের তুল্য (তিন রাকআত)।[৯]

৭। মাআনিউল আছার-এ উল্লেখ আছে ঃ

سَأَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ عَلَّمَنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ هٰذَا وِتْرُ اللَّيْلِ وَهٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ

অর্থাৎ রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন– আমি আবুল আলিয়াকে বিতর নামাযের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম; তিনি বললেন, নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাগণ আমাদেরকে (তাবিয়ীগণকে) শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিতর মাগরিবের নামাযের ন্যায় (তিন রাকআত)। এটা রাত্রির বিতর এবং মাগরিব দিনের বিতর।[১০]

৮। সহীহ বুখারীতে উল্লেখ হয়েছে ঃ

قَالَ الْقَاسِمُ رَأَيْنَا اُنَاسًا مُنْذُ اَدْرَكْنَا يُوْتِرُوْنَ بِثَلٰثٍ

অর্থাৎ ইমাম কাসেম বলেছেন–আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া অবধি (মদীনা শরীফে) সাহাবাগণকে তিন রাকআত বিতর পড়তে দেখেছি।[১১]

৯। ফতহুল কাদীর নামক তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْوِتْرَ ثَلٰثٌ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ (رواه ابن ابى شيبه)

অনুবাদ ঃ ইমাম ইবনে আবী শায়বা ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানদের ঐক্যমত হয়েছে যে, বিতর তিন রাকআত। শেষ ভাগে ব্যতীত কেউই সালাম ফিরাতেন না। (ইবনে আবী শায়বা)[১২]

১০। ইমাম আহমদ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন ঃ

يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ

অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) তিন রাকআত বিতর পড়তেন। এদের মাঝে সালাম ফিরায়ে (নামায) বিচ্ছেদ করতেন না।[১৩]

১১। عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَجْزَاَتْ رَكْعَةٌ قَطُّ

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন– এক রাকআত নামায কখনও যথেষ্ট নয়।[১৪]

১২। 'মাআনিউল আছার' কিতাবে ইমাম তাহাবী উল্লেখ করেন ঃ

اَثْبَتَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ الْفُقَهَاءُ ثَلٰثًا لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ ـ

অর্থাৎ খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয ফকীহ ইমামগণের ফতওয়া অনুসারে মদীনা শরীফে এক সালামে তিন রাকআত 'বিতর'-এর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[১৫]

১৩। ইমাম আহমদ হযরত আয়েশার সনদে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ

অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) তিন রাকআত বিতর (নামায) পড়তেন, কিন্তু এদের সালামের মাধ্যমে পৃথক করতেন না।[১৬]

১৪। বুখারীর শরাহ উমদাতুল কারীতে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী উল্লেখ করেছেন ঃ

وَمِمَّنْ قَالَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ، عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنَسٌ وَاَبُوْ اُمَامَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ وَاَهْلُ الْكُوْفَةِ ـ

অর্থাৎ হযরত উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা, ইবনে আব্বাস, আনাস, আবূ উমামা (রাঃ হুম), উমর বিন আবদুল আযীয ও সাত জন ফকীহ এবং কুফাবাসী আলিমগণ বলতেন– তিন রাকআত বিতর পড়তে হবে– দ্বিতীয় রাকআতে সালাম দিতে হবে না।১৭

১৫। 'মুসনাদে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা' হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ

أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى مِنَ الْوِتْرِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ -

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতরের নামায তিন রাকআত আদায় করতেন। প্রথম রাকআতে সাব্বিহিসমা ...দ্বিতীয় রাকআতে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে কুলহুয়াল্লাহু আহাদ তিলাওয়াত করতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হুযূর (সাঃ) বিতরের প্রথম রাকআতে আলহামদু এবং সাব্বিহিসমা ... ... দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু এবং কুলইয়া আইউহাল কাফিরূন তৃতীয় রাকআতে আলহামদু এবং কুলহুয়াল্লাহু আহাদ তিলাওয়াত করতেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'বিতর' তিন রাকআত পড়তেন।১৮

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বংগানুবাদ 'মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা' গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, অবিকল তা নিচে উদ্ধৃত করা হল ঃ

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের প্রেক্ষাপটে বিতর কত রাকআত এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে বিতর তিন রাকআত এবং ইমাম মালেক (রাঃ) ও ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বিতর এক রাকআতের পক্ষে মত পোষণ করেছেন। উভয় দল বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। বাক্য বিভিন্ন হলেও এ সবের অর্থ প্রায় নিকটবর্তী। যেমন এক ব্যক্তি হুযূর (সাঃ)-এর নিকট রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন– مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً لَوْ تَرَكَ صَلٰوتُكَ (রাতের নামায) দু' দু' রাকআত, যখন ভোর হওয়ার আশংকা থাকে, তখন এক রাকআত পড়ে লও। এতে তোমার নামায বিতর (বেজোড়) হয়ে যাবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– فَاَوْتِرُوْا بِوَاحِدَةٍ এক রাকআত মিলিয়ে দু'রাকআতকে বিতর করে লও।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে কতিপয় জোরালো দলীল পেশ করেছেন। প্রথম হাদীস يُوتِرُ بِثَلٰثٍ হযরত নবী করীম (সাঃ) বিতর তিন রাকআত পড়তেন। অতঃপর প্রত্যেক রাকআতের পৃথক কিরাআত নির্ধারিত হলো এবং পৃথক তাহরীমা ব্যতীত তৃতীয় রাকআত মিলিয়ে পড়ার বিধান জারী হলো। দ্বিতীয় বুখারী ও মুসলিম শরীফের শর্তানুযায়ী হাকিম হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতর তিন রাকআত পড়তেন এবং শেষে ছাড়া সালাম ফিরাতেন না। তৃতীয় নাসায়ী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– নবী করীম (সাঃ) বিতরের দু'রাকআতে সালাম ফিরাতেন না। ৪র্থ দারে কুতনী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ كَانَ النَّبِىُّ صلعم لَا يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْوِتْرِ –'রাতের বিতর নামায হলো তিন রাকআত যেমন দিনের বিতর নামায মাগরিব হলো তিন রাকআত।'

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই হাদীস মারফু, সহীহ নয়। সুফইয়ান সওরী ও অন্যান্য ইমামগণ এটি মওকুফ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এখানে

বলা যায়, হাদীস মওকুফ ও আহকামের ক্ষেত্রে মরফুর মর্যাদা রাখে। সুতরাং এখন তৃতীয় রাকআতকে প্রথম দু'রাকআত থেকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। এই মতের স্বপক্ষে আরও দলীল হলো এই যে, তিনি আবুল আলিয়াকে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম আমাদেরকে মাগরিবের নামাযের মত বিতর শিক্ষা দিয়েছেন। এটা হলো রাতের বিতর এবং মাগরিব হলো দিনের বিতর। পঞ্চম, বুখারী ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমরা লোকদেরকে বিতরের নামায তিন রাকআত পড়তে দেখেছি। ষষ্ঠ, হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলেও এটাই ছিল। হাকিম মুস্তাদরাক নামক হাদীস গ্রন্থে হাবীব মুআল্লিম থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাঃ)-এর নিকট বলেন, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বিতরের দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে থাকেন। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন– হযরত উমর (রাঃ) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে অধিক ফকীহ ছিলেন। তিনি দু'রাকআতের পর তাকবীর বলে উঠে যেতেন। সপ্তম, ইবনে আবী শায়বা হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

اِجْتَمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْوِتْرَ ثَلٰثٌ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

“জমহুর মুসলমান এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, বিতর হলো তিন রাকআত এবং নামায শেষ করা ব্যতীত কেউ সালাম ফিরায়নি। এর পর ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) মুওয়াত্তায়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক রাকআত কখনো যথেষ্ট নয়। উভয় ইমামদ্বয়ের দলীল দেখা যেতে পারে। فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ অথবা تُوْتِرُ لَكَ صَلٰوتَكَ যদি উপরোক্ত দু'হাদীস শাফিয়ী ও মালেকী মাযহাবের দলীল হয়, তাহলে হানাফী মাযহাবেরও এই হাদীস দলীল হবে। কেননা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, ঐ দু'রাকআত নামাযের সাথে এক রাকআত মিলিয়ে তিন রাকআত বিতর করে লও। কিন্তু নতুন তাহ্‌রীমার মাধ্যমে বিতরকে এক রাকআত হিসেবে পৃথক আদায় করে নেওয়া এটা হাদীসের অর্থ নয়। হাদীসসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে দু'রাকআতের পর নতুন তাহরীমার মাধ্যমে পৃথক করে এক রাকআত পড়া জায়েয নয়।১৭

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সহীহ হাদীস অনুযায়ী এক সালামে তিন রাকআত বিতর নামায আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

তথ্যসূত্র

১। মুসনাদে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা, হাদীস নং ১৫৩।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৯৫-১৯৬।

৩। তুহ্ফাতুল মু'মিনীন, কৃত মাওঃ শামসুদ্দীন মোহনপুরী।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ-১২২।

৫। উর্দূ মুতারজম তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-২৫৮-২৫৯।

৬। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ-৫৯।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬০।

৮। উর্দূ মুতারজাম মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ, পৃঃ-১১১।

৯। প্রাগুক্ত।

১০। মা'আনিউল আছার, পৃঃ-১৬৪।

১১। সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৩৩ (মিসরী ছাপা)

১২। ফতহুল কাদীর, পৃঃ-১৭৭।

১৩। সাইফুল মুকাল্লেদীন, কৃত মাওঃ ইবরাহীম মুহাব্বাতপুরী, পৃঃ-১৩৯।

১৪। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ-৫৯।

১৫। মাআনিউল আছর, পৃঃ-১৬৭।

১৬। সাইফুল মুকাল্লেদীন, কৃত মাওঃ ইবরাহীম মুহাব্বাতপুরী, পৃঃ- ১৩৯।

১৭। আইনী গ্রন্থ, পৃঃ-৪০৫।

১৮। বংগানুবাদ মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা, ১৯৭-১৯৯।

১৯। প্রাগুক্ত।

তারাবীর নামায আট রাকআত নয়– বিশ রাকআত

তারাবীর নামায বিশ রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এই নামায জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নাত। নবী করীম (সাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাকআতে তারাবীহ নামায আদায় করেছিলেন। তিনি বিশ রাকআতও তারাবীহর নামায আদায় করেছেন। তবে হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামদের এজমা দ্বারা রমযান মাসের মধ্যে বিশ রাকআত তারাবীহ এর নামায জামাতের সাথে আদায় করার রীতির প্রচলন হয়। এই জন্যই হানাফীগণ তারাবীহের নামায বিশ রাকআত আদায় করে থাকেন। নিচে এর প্রমাণাদি আলোকপাত করা হল।

১। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرُ ـ

অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাসে (একাকী) বিশ রাকআত (তারাবীহ) নামায আদায় করতেন। অতঃপর বিতর নামায পড়তেন।[১]

২। উক্ত কিতাবে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ سَائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مِثْلُهٗ

অর্থ ঃ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন ঃ হযরত উমরের যমানায় তাঁরা সকলেই রমযান মাসে (প্রত্যেক রাত্রি) বিশ রাকআত করে তারাবীহর নামায পাঠ করতেন। উসমান ও আলী (রাঃ)-এর যমানায়ও তদ্রূপ পড়া হতো।[২]

৩। বুখারী শরীফের হাশিয়ায় উল্লেখ আছে ঃ

رَوٰى اِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيْ وَالْبَيْهَقِيْ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ

অর্থ ঃ হযরত ইবনু আবূ শায়বা, তাবরানী ও ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস বর্ণনা করেছেন– নবী করীম (সাঃ) রমযানের রাত্রিতে বিতর ব্যতীত বিশ রাকআত নামায (তারাবীহ) আদায় করতেন।[৩]

৪। 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থাৎ হযরত ইয়াযীদ ইবনে রাউমান হতে বর্ণিত আছে– হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় মানুষ বিতরসহ তেইশ রাকআত তারাবীহ্‌র নামায পড়তেন।[৪]

৫। عَنْ اَبِى الْحَسَنِ اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِهِمْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً –

অর্থ ঃ হযরত আবুল হাসান হতে বর্ণিত আছে– রমযানে মুসল্লিসহ বিশ রাকআত নামায পড়ার জন্য হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ইবনে আবী শায়বা)[৫]

৬। عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَّابٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُصَلِّيْ لَنَا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ الاَعْمَشُ كَانَ يُصَلِّيْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ ـ

অর্থ ঃ হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রমযান মাসে আমাদের নামায পড়াতেন।

হযরত আ'মাশ বলেন– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিশ রাকআত নামায পড়তেন এবং বিতর তিন রাকআত পড়তেন।– আইনী গ্রন্থ দ্রঃ।[৬]

৭। তিরমিযী শরীফে 'সাওম' অধ্যায়ে ইমাম আবূ ঈসা (রহঃ) তিরমিযী বলেন ঃ

اِخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِیْ قِیَامِ رَمَضَانَ فَرَأٰی بَعْضُهُمْ اَنْ یُّصَلِّیَ اِحْدٰی وَاَرْبَعِیْنَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ وَهُوَ قَوْلُ اَهْلِ الْمَدِیْنَةِ وَالْعَمَلُ عَلٰی هٰذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِیْنَةِ وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰی مَارُوِیَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِیٍّ وَ غَیْرِهِمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِیْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِیْ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِیْ وَقَالَ الشَّافِعِیْ وَهٰكَذَا اَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ یُصَلُّوْنَ عِشْرِیْنَ رَكْعَةً

অনুবাদ ঃ রমযানের কিয়াম (তারাবীহ) সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন ঃ বিতরসহ এর রাকআত একচল্লিশ। তা হল মদীনাবাসীদের অভিমত এবং মদীনাবাসীদেরও এরূপ আমল রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের অভিমত হযরত উমর ও হযরত আলী প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণনানুযায়ী (তারাবীহ) রাকআত সংখ্যা হলা বিশ। সুফইয়ান সওরী, ইবনে মুবারক ও শাফিয়ীর এই অভিমত। ইমাম শাফিয়ী বলেন, আমাদের নগর মক্কায়ও এ ধরনের আমল দেখেছি। তারা বিশ রাকআত (তারাবীহ) নামায আদায় করেন।[৭]

৮। 'আউজাযুল মাসালিক গ্রন্থে' উল্লেখ হয়েছে ঃ

صَلَّی النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ ثَلَاثَ لَیَالِیَ وَلَهُمْ یُصَلِّیْ مَعَهُمْ مَخَافَةَ الْوُجُوْبِ فِیْ رَمَضَانَ بِالْجَمَاعَةِ لِاِرْتِفَاعِ الْمَانِعِ مَعَ اِتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ فِیْ زَمَنِ عُمَرَ رض وَبَعْدَهٗ وَیُصَلُّوْنَ عِشْرِیْنَ رَكْعَةً لِاَنَّهٗ رُوِیَ عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّىٰ بِهِمْ فِىْ هٰذِهِ اللَّيَالِىْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً (رواه ابن ابى شيبة)

আনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আবূ শায়বা বর্ণনা করেন ঃ সাহাবাগণসহ নবী করীম (সাঃ) মাত্র তিন রাত্রি তারাবীহ-এর নামায পড়েছিলেন। এই নামাযে নবী করীমের সাথে সাহাবাগণ শরীক হয়েছিলেন বটে, কিন্তু নবী করীম সাহাবাগণকে এই নামাযের জন্য আহ্বান করে একত্র করেন নাই। কারণ এর ফলে এই নামায (তারাবীহ) ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। এই আশংকা দূরীভূত হওয়ার কারণে এবং বিশ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় ও পরবর্তীকালে সাহাবাগণের একমত হওয়ার ফলে জামায়াত সহকারে এ নামায পড়া সুন্নাত হিসেবে গৃহীত হয়। কেননা হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– নবী করীম (সাঃ) সাহাবাগণসহ ঐ রাত্রিগুলোতে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়েছিলেন।[৮]

৯। উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে ঃ

"এই কথাটি প্রসিদ্ধ যে, তারাবীহ এর নামায বিশ রাকআত। বিশ রাকআত সম্বন্ধীয় হাদীস নবী করীম হতে হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত। আব্দ ইব্ন হুমাইদ 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে, ইমাম বাগুবী 'মুজাম' গ্রন্থে, ইমাম তাবরানী 'আল-কবীর' গ্রন্থে ও ইমাম বায়হাকী 'সুনান' গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকেই ইবন আবী শায়বার সনদ অনুসরণ করেছেন। হযরত ইবনে আবদুল বার বলেছেন– এটাই অধিকাংশ উলামার অভিমত এবং কুফাবাসীগণ, ইমাম শাফিয়ী ও অধিকাংশ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটাই হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে ব্যক্ত করেছেন। এটাই হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বিশুদ্ধভাবে সাহাবাদের মতভেদ ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে।"[৯]

১০। বুখারী শরীফের শরাহ উমদাতুল কারীর ৫ খণ্ডে উল্লেখ হয়েছে ঃ

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْحَجَرُ مَكِّىْ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ـ

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী বলেন, সাহাবাগণ এ বিষয়ে একমত যে, তারাবীহ নামায বিশ রাকআত।[১০]

অতএব, ইমাম আযম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারী ফকীহগণের গৃহীত মতানুযায়ী তারাবীহ-এর নামায বিশ রাকআত জামাতের সাথে আদায় করা

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে প্রত্যক্ষভাবে ছাবেত না হলেও পরোক্ষভাবে ছাবেত হয়েছে। কারণ এটা অবশ্যই সহীহ হাদীসে ছাবেত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) রমযানের তিন রাত্রি অর্থাৎ ২৩, ২৫ ও ২৭শে রমযানে তারাবীহের নামায সাহাবাদের সংগে পড়েছিলেন। এরপর ত্যাগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমাদের ওপর তা ফরয হবার আশংকা করেছিলাম। মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে অত্র হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) বিশ রাকআত জামাতের সাথে তারাবীহের নামায আদায় করেছেন, তা সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে। সুতরাং তা আমাদের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। এর বরখেলাফ করলে আমরা গোনাহগার হবো। কারণ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (مسند احمد)

"তোমাদের অনুসরণ করে চলতে হবে আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত সত্যপন্থী খলীফাদের সুন্নাত। তোমরা তা শক্ত করে ধরবে, দাঁত দিয়ে কামড়ায়ে ধরে স্থির হয়ে থাকবে। (যেন কোন অবস্থায়-ই তা হাতছাড়া হয়ে না যায়, তোমরা তা হতে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত হয়ে না পড়ো।" অতএব খুলাফায়ে রাশেদীন চতুষ্টয় তারাবীহের নামায বিশ রাকআতের পক্ষে সমর্থন করেছেন, বিধায় আমাদেরকেও তারাবীহ-এর নামায বিশ রাকআত আদায় করতে হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। উচ্চ মাধ্যমিক ইসঃ স্টাডিজ, কৃত আবদুল মান্নান খান, পৃঃ–৪০৬।

২। মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, পৃঃ–৪৫।

৩। হাশিয়ায়ে বুখারী শরীফ, পৃঃ–১৫৪।

৪। মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, পৃঃ–৪৫।

৫। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ–৬৪।

৬। প্রাগুক্ত।

৭। উর্দূ মুতারজম তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃঃ–৩৯৮।

৮। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ–৬৫।

৯। প্রাগুক্ত।

১০। উমদাতুল ক্বারী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ–৩৫৫-৩৫৭।

ছয় তাকবীরে ঈদের নামায

ঈদের নামাযের নিয়ম-কানূন অন্যান্য নামায হতে একটু আলাদা। দুই রাকআত নামাযে ছয় বার অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হয়। তাকবীরে তাহরীমার পর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে প্রথম রাকআতে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআত শেষ করার পর রুকূ করার পূর্বে তিন তাকবীর বলতে হয়। ঈদের নামাযে এরূপে ছয় বার তাকবীর বলা ওয়াজিব।

নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবীগণ অনুরূপভাবে ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামায পড়তেন। এ জন্যই হানাফীগণ ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামায আদায় করে থাকেন। নিচে এর প্রমাণাদি পেশ করা হল।

১। আবূ দাউদ শরীফ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَةً عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ

অর্থ ঃ হযরত সাঈদ ইবনুল আস হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আবূ মূসা (রাঃ) ও হুযায়ফা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিরূপে তাকবীর বলতেন? অতঃপর হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বললেন, জানাযার তাকবীরের ন্যায় (তাকবীরে তাহরীমাসহ) চারবার তাকবীর বলতেন। তখন হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, হযরত আবূ মূসা (রাঃ) সত্য কথাই বলেছেন।[১]

২। তিরমিযী শরীফ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে ঃ

رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّهُ قَالَ فِى التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى خَمْسُ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيْرَةِ

الرُّكُوعِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيْ ـ

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি উভয় ঈদের নামাযে নয় তাকবীরের কথা বলেছেন। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহ্‌রীমা ও রুকূর তাকবীরসহ মোট পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর তাকবীরসহ কিরআতের পর মোট চার তাকবীর। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার এক তাকবীর এবং দুই রুকূর দুই তাকবীরসহ মোট নয় তাকবীর বলতেন। এই তিন তাকবীর ব্যতীত ঈদের নামাযে মাত্র ছয় তাকবীর বলতেন। নবী করীম (সাঃ)-এর একাধিক সাহাবা হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটাই কুফাবাসীদের অভিমত এবং হযরত সুফইয়ান সওরীও অনুরূপ বলেছেন।[২]

৩। মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ নামক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِى الْأُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِى الْاٰخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ قَدِاخْتَلَفَ النَّاسُ فِى التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ فَمَا أَخَذْتَ بِهٖ فَهُوَ حَسَنٌ وَأَفْضَلُ ذٰلِكَ عِنْدَنَا مَارُوِىَ إِبْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهٗ كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ عِيْدٍ تِسْعًا وَأَرْبَعًا فِيْهِنَّ تَكْبِيْرَةُ الْإِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ وَيُوَالِىْ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَيُؤَخِّرُهَا فِى الْأُوْلٰى وَيُقَدِّمُهَا فِى الثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ হযরত নাফে (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায পড়েছি। তিনি প্রথম রাকআতে

কিরআতের পূর্বে সাত তাকবীর দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, দুই ঈদের সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতভেদ আছে। যে কোন একটির ওপর আমল করলে যথেষ্ট হবে। আমাদের নিকট হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাই উত্তম। তিনি প্রত্যেক ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলেন। প্রথম রাকআতে পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে চার তাকবীর বলতেন। তাকবীর তাহ্‌রীমা এবং রুকূর তাকবীরসহ এই নয় তাকবীর। তিনি প্রথম রাকআতের প্রথমে এবং দ্বিতীয় রাকআতের শেষে তাকবীর বলতেন। আর তিনি প্রথম রাকআতে তাকবীরের পর এবং দ্বিতীয় রাকআতে তাকবীরের আগে কিরআত পড়তেন। এটাই আবূ হানীফা (রঃ)-এর অভিমত।

উক্ত কিতাবে উল্লেখ হয়েছে যে, দুই ঈদের তাকবীর সম্পর্কে সাহাবাদের মধ্যে অভিমত পেশ করেছেন। হানাফীগণ প্রথম শ্রেণীর সাহাবা এবং নবী করীম (সাঃ)-এর খাদেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনাকে পছন্দ করেছেন এবং আমল করেছেন।[৩]

৪। শরহে মা'আনিউল আছার গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে–

اِنَّ الْقَاسِمَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثَهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ صلعم يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَاَرْبَعًا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ حِيْنَ اِنْصَرَفَ قَالَ لَاَ تَنْسَوْا كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهٖ وَقَبَضَ اِبْهَامَهٗ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ فَاَحْتَمَلَ بِاَنْ يَّكُوْنَ الْاَرْبَعُ سِوٰى تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ -

অর্থ ঃ হযরত আবূ আবদুর রহমান কাসিম (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল (রাঃ)-এর জনৈক সাহাবী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক সময় নবী করীম (সাঃ) আমাদের সংগে ঈদের নামায আদায় করলেন। তিনি উভয় রাকআতেই চার তাকবীর বললেন। নামায শেষ করে তিনি আমাদের দিকে মুখ

ফিরায়ে বললেন, তোমরা ভুলে যেও না ঈদের নামাযের তাকবীর জানাযার নামাযের তাকবীরের ন্যায়। এর পর রাসূল (সাঃ) চার আংগুলের দিকে ইংগিত করলেন এবং বৃদ্ধাংগুলি বন্ধ করে ফেললেন। (ইমাম) আবূ জাফর বলেছেন, প্রথম রাকআত সম্ভবত তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত চার তাকবীর ছিল।[৪]

৫। মিশকাত শরীফ হাদীস গ্রন্থের শরাহ তানযীমুল আশতাত (উর্দূ) নামক কিতাবে উল্লেখ হয়েছেঃ

وَفِي الْبَيْهَقِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِبْنِ سَعْدٍ وَعُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَبْنِ سَعْدٍ عَنْ اٰبَاءِ هِمْ عَنْ اَجْدَادِهِمْ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَبَّرَ فِي الْاُوْلٰى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيْ خَمْسًا لیکن امام اعظم وسفیان ثوری وابن مسعود الانصاری وابوموسی اشعری وغیرهم کے نزدیك رکعت اولی میں تکبیراحرام کے بعد قبل القرأة تین تکبیر اور رکعت ثانیه میں بعد القرأة تین تکبیر ۔

অর্থ ঃ বায়হাকী হাদীস গ্রন্থে ইরশাদ হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) (ঈদের নামাযে) প্রথম রাকআতে সাত বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ বার তাকবীর বলতেন। কিন্তু ইমাম আযম, সুফইয়ান সওরী, ইবনে মাসউদ আনসারী এবং আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) প্রমুখের নিকটে প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমার পর কিরআতের পূর্বে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরআতের পর তিন তাকবীরের অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫]

একথা প্রকাশ থাকে যে, প্রথম রাকআতের তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ ও সেজদার তাকবীরসহ সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআত ও রুকূর তাকবীরসহ পাঁচ তাকবীর বলে উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

৬। তানযীমুল আশতাত গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

نیز طحاوی کی باب التکبیر علی الجنائز کی ایك طویل حدیث میں هے که تکبیر علی الجنائز سات هے یا پانچ یا چار

اس میں اختلاف هے حضرت ابو بکر صدیق رض کی وفات کے بعد تک رهاجب حضرت عمر رض خلیفه هوکر یه اختلاف دیکها تو بعض رجال من الصحابه کو جمع کرکے فرمایا که انظروا امرا تجتمعون علیه فاجمعوا امرهم علی ان یجعلوا التکبیر علی الجنائز مثل التکبیر فی الاضحی والفطر اربع تکبیرات اب عید میں بهي چار تکبیر هونے پر صحابه کا اجماع هوگیا ـ

অর্থ ঃ তাহাবী শরীফে জানাযা নামাযের তাকবীর সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জানাযার নামাযের তাকবীর সাত অথবা পাঁচ অথবা চার সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত মতভেদ ছিল।

হযরত উমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর উক্ত মতভেদ দেখে এক দল সাহাবাকে একত্রিত করে বললেন ঃ তাকবীরের মতভেদ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে ঐক্যের অবলম্বন কর। অতঃপর তারা ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার তাকবীর তাহরীমাসহ চার তাকবীরে জানাযার নামায। অতএব প্রমাণিত হয় যে, চার তাকবীরের ঈদের নামায (তাকবীর তাহরীমাসহ) সাহাবাগণের ঐক্যমত (ইজমা) হয়ে গেছে।[৬]

৬। মুসনাদে আহমদ ও ইবনু মাজাহ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رض عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِىْ عِيْدٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعًا فِى الْاُوْلٰى وَخَمْسًا فِى الْاٰخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ـ

হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা হতে– তাঁর দাদা হতে বর্ণিত হয়েছেঃ নবী করীম (সাঃ) ঈদের নামাযে বারটি তাকবীর বলেছেন। তন্মধ্যে সাতটি প্রথম রাকআতে ও পাঁচটি দ্বিতীয় রাকআতে তাকবীর দিয়েছেন। এর পূর্বেও নামায পড়েন নাই, এর পরও না।

উপরোল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত আলিম মাওঃ আবদুর রহীম সাহেব রচিত গ্রন্থ হাদীস শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে যা লিখেছেন, তা নিচে উদ্ধৃত করা হল।

ঈদের দুই রাকআত নামাযে অতিরিক্ত কতটি তাকবীর দিতে হবে এবং তা কোন কোন সময় দিতে হবে এই পর্যায়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত ও গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। এর ফলে হাদীসবিদদের মধ্যেও এই উভয় পর্যায়ে কতটি তাকবীর দিতে হবে এবং কোন কোন সময় দিতে হবে– বিরাট মতভেদের উদ্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন লোক (বিদ্বান) বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

আমি সেই সকল মতসমূহের মধ্যে কয়েকটি মত উল্লেখ করলাম।

১। প্রথম রাকআতে কোরআন পাঠের পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে কোরআন পাঠের পূর্বে পাঁচটি– এই মোট বারটি তাকবীর দিতে হবে। মুহাদ্দিস আল্-ইরাকী বলেছেন, সাহাবা, তাবেয়ী ও ফিক্হের ইমামদের অধিকাংশেরই এই মত। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত সাঈদ, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবূ আইউব, হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও এ মতই বর্ণিত হয়েছে। মদীনার সাতজন ফিক্হবিদ এবং উমর ইবনে আবদুল আযীয, যুহরী, মাকহুল, মালিক, আওযায়ী, ইমাম শাফিয়ী, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ হাদীস ও ফিক্হবিশারদ মনীষীও এই মত প্রকাশ করেছেন।

২। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমার পরে তিনটি তাকবীর কোরআন পাঠের পূর্বে দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে কোরআন পাঠের পর তিনটি তাকবীর দিতে হবে। সাহাবাদের একটি জামা'আত– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবূ মূসা আল-আনসারী (রাঃ হুম) হতে এটা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ এই মতই গ্রহণ করেছেন।

৩। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আরও চারটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে তাকবীর দিতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এই মত সমর্থন করেছেন।

৪। চতুর্থ মতটি প্রথম মতের অনুরূপ। পার্থক্য এই যে, প্রথম রাকআতে তাকবীরের পর কোরআন পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকআতে কোরআন পাঠের পর তাকবীর বলবে।

প্রথম মতটি উপরে উদ্ধৃত ও এই অর্থে বর্ণিত অপর কয়টি হাদীসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। হযরত হাস্সানের সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম

(সাঃ) ঈদের নামাযেই প্রথম রাকআতে সাতটি ও দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচটি তাকবীর বলেছেন। মূলত এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইবনে আমর, জাবির ও ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। দ্বিতীয় মতটির উৎস হযরত আবূ মূসা (রাঃ) ও হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রথমে এই মতের সমর্থনে ফতওয়া দিয়েছিলেন। এই মতের ব্যাখ্যা এই যে, হাদীসে মোট চারটি তাকবীরের উল্লেখ হয়েছে, তাকবীর তাহরীমাও এর মধ্যে গণ্য। ফলে অতিরিক্ত তাকবীর হয় মাত্র তিনটি। অবশ্য দ্বিতীয় রাকআতের ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা অচল। তৃতীয় মত হযরত আবূ মূসা হযরত হুযায়ফা বর্ণিত হাদীস হতে গৃহীত। চতুর্থ মতের উৎস আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস।

তাকবীরসমূহ এক সংগে ও পরপর মিলিতভাবে দেওয়া হবে, না কোন হামদ বা তাস্‌বীহ পাঠ দ্বারা এদের মাঝে পার্থক্য করা হবে। এ পর্যায়ে ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযায়ী বলেছেন ঃ তাকবীরসমূহ রুকূ-সিজদার তাসবীহ পড়ার মতই মিলিত ও পরপর দিতে হবে। কেননা হাদীসের বর্ণনাসমূহ তাকবীরগুলোর মাঝে পার্থক্য করার ও পরপর না দেওয়ার কোন কথা বলা হয় নাই। অবশ্য ইমাম শাফিয়ী তাকবীরসমূহের মাঝে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি দোআ-তাসবীহ পাঠ করে পার্থক্য করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। (নায়লুল আওতার)[৭]

৭। 'আবূ দাউদ' শরীফের হাশিয়ায় উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَمِنْهَا فِي الْأُوْلٰى ثَلَاثٌ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثٌ بَعْدَ الْقِرَأَةِ وَهُوَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ مُوْسٰى أَبِيْ مَسْعُوْدٍ اَلْاَنْصَارِيْ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيْ وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ

অর্থাৎ ঈদের নামাযের তাকবীর সম্বন্ধে এটা একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। তাকবীর তাহ্‌রীমার পর রাকআতে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরআতের পর তিন তাকবীর। হযরত ইবনে মাসউদ, আবূ মূসা ও আবূ মাসউদ (রাঃ হুম) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটাই সুফইয়ান সওরী ও ইমাম আবূ হানীফার অভিমত।[৮]

৮। সুপ্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী'তে ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"ইমাম দুই রাকআত নামায পড়বে। প্রথম তাকবীর বলে ছানা পড়ে তিনবার তাকবীর বলবে। তারপর উচ্চ শব্দে কিরআত পড়বে, তারপর রুকূ-সিজদাহ্ করবে। দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রথমে কিরআত পড়ে তারপর তিনবার তাকবীর বলবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকূতে যাবে। ঈদের নামাযে এরূপ অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলতে হয়। তিনবার প্রথম রাকআতে বলতে হয় এবং তিনবার দ্বিতীয় রাকআতে বলতে হয়। উভয় রাকআতে কিরআত পড়তে হয় এবং অতিরিক্ত তাকবীরসমূহে কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হয়। এক তাকবীর হতে অন্য তাকবীর যেতে তিন তাসবীহ পরিমাণ থামতে হয়। এটা 'তাবিয়ীন' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে।

অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ বলার সময়ে দু'হাত দু'কান পর্যন্ত উঠিয়ে আবার ছেড়ে দিবে। নামাযের পরে দু'টি খুতবাহ্ পাঠ করতে হয়। দুই খুতবার মধ্যস্থলে সামান্য সময় ইমামের বসতে হয়। তা হানাফীদের প্রামাণ্য ফতওয়ার কিতাব কাজীখানে বর্ণিত আছে।"[৯]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের আমল সঠিক ও হাদীসসম্মত।

তথ্যসূত্র ঃ

১। মিশকাত শরীফ, সালাতুল ঈদাইন অনুচ্ছেদ, পৃঃ-১২৬।

২। জামে তিরমিযী মুতারজম উর্দূ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-২৯২।

৩। মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (উর্দূ), পৃঃ-১০২।

৪। শরহে মা'আনিউল আছার, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৩৩৩।

৫। তানযীমুল আশ্‌তাত (উর্দূ) শরাহ মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৪৭৫।

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ-৪৭৬।

৭। হাদীস শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রণেতা-মাওঃ আবদুর রহীম, পৃঃ-২৭১-২৭৪।

৮। আবূ দাউদ শরীফের হাশিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১১৪।

৯। বংগানুবাদ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ-২৭৭।

চার তাকবীরে জানাযার নামায

জানাযার নামায বাস্তবে আল্লাহ পাকের নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা। জীবিত লোকদের মধ্যে যারা মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছে তাদের ওপর জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। এই নামাযের নিয়ম হল, প্রথমে নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমার মত বেঁধে 'ছানা' পড়বে। তারপর দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কিন্তু হাত বাঁধবে না। তাকবীর বলে দরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর তৃতীয় তাকবীর বলে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ পড়বে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে দু'দিকে সালাম ফিরাবে। ছানা, দরূদ ও দো'আ পড়বে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে দু'দিকে সালাম ফিরাবে। ছানা, দরূদ ও দো'আ পাঠ করা সুন্নাত। কিন্তু চার তাকবীর ফরয। আহলে হাদীস (লা-মাযাহাবী) সম্প্রদায় জানাযার নামাযে পাঁচ তাকবীর বলে থাকেন। কিন্তু আমরা হানাফীগণ জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলে থাকি। প্রমাণ নিচে পেশ করা হল ঃ

১। তিরমিযী শরীফের হাদীস ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَى النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى وَجَابِرٍ وَيَزِيْدَبْنِ ثَابِتٍ وَاَنَسٍ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَيَزِيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ اَخُوْزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ شَهِدَ بَدْرًا وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ التَّكْبِيْرَ عَلَى الْجَنَازَةِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىْ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِىْ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ ـ

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) নাজ্জাশীর জন্য জানাযার নামায আদায় করেন এবং এতে তিনি চারবার তাকবীর পাঠ করেন। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস, ইবনে আবূ আওফা, জাবির, আনাস ও ইয়াযীদ ইবনে ছাবিত (রাঃ হুম) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (রহঃ) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) হলেন যায়দ ইবনে ছাবিত (রাঃ)-এর ভাই। তিনি ছিলেন বড়। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু যায়দ বদরে শরীক ছিলেন না। ইমাম আবূ ঈসা (রাঃ) আরও বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এই হাদীসের ওপর আমল রয়েছে। তাঁরা জানাযার নামাযে চার তাকবীর পাঠ করার মত গ্রহণ করেছেন। এটা সুফইয়ান সওরী, মালিক ইবনে আনাস, ইবনে মুবারক, শাফিয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রঃ)-দের অভিমত।[১]

২। মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ قَالَ لَهُمْ اُنْظُرُوْا اٰخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاجَدُوْهُ قَدْ كَبَّرَ اَرْبَعًا حَتّٰى قَبَضَ قَالَ عُمَرُ فَكَبِّرُوْا اَرْبَعًا ـ

অনুবাদ ঃ অনেক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর অনেক সাহাবা (রাঃ)কে একত্রিত করে জানাযার তাকবীর সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করে বলেন, তোমরা নবী (সাঃ)-এর ঐ শেষ নামাযকে স্মরণ কর, যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ নামাযে তিনি কয়টি তাকবীর বলেছিলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম চিন্তা করে বললেন, তিনি ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত চার তাকবীর বলেছিলেন। সুতরাং হযরত উমর (রাঃ) জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[২]

চারজন ইমাম এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, জানাযার নামাযে চার তাকবীর সঠিক। কেননা, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের এই বিষয়ে ঐক্যমত

রয়েছে। 'হাকীম মুস্তাদরাক' নামক গ্রন্থে এবং 'আবূ নাঈম হুলিয়া' নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, ফিরিশতাগণ হযরত আদম (আঃ)-এর ওপর নামায পড়ার সময় চার তাকবীর বলেছেন এবং আরও বলেছেন, হে বনী আদম! তোমাদের জন্য এটাই সুন্নাত। নবী করীম (সাঃ)-এর জানাযার তাকবীর সর্বশেষ আমল হিসাবে কয়টি ছিল এই ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ ছিল এই যে, তিনি বাইয়াতে রিদওয়ান ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জানাযায় নয় তাকবীর এবং যাঁরা শুধু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জানাযায় সাত তাকবীর বলেছিলেন। এছাড়া তিনি সকল জানাযায় চার তাকবীর বলেছিলেন।

৩। 'মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ' হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ـ

অনুবাদ ঃ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) হতে বর্ণিত। যেদিন নাজ্জাশীর বাদশাহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন এবং লোকদেরকে নিয়ে তিনি ঈদগাহে গেলেন। তারপর তিনি কাতারবন্দি হয়ে চার তাকবীরে জানাযার নামায আদায় করলেন।[৩]

উল্লেখ্য যে, বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩]

৪। মুসলিম শরীফের হাদীস গ্রন্থে কিতাবুল জানায়েয– এ উদ্ধৃত হয়েছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا ـ

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আস্‌হামাহ নাজ্জাশীর জানাযার নামায আদায় করেছেন এবং নামাযে চার তাকবীর বলেছেন।[৪]

৫। মুসলিম শরীফ হাদীস গ্রন্থে জানাযা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণিত ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهُ قَالَ نَعٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلّٰى فَصَلّٰى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ـ

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাশীর যে দিন মৃত্যু হয় সেদিন রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইবনে শিহাব (রঃ) বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব আমাকে বলেছেন যে, আবূ হুরায়রা তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে নিয়ে নামাযের স্থানে কাতার করলেন। অতঃপর তিনি নামায আদায় করলেন এবং জানাযায় চার তাকবীর বললেন।[৫]

৬। উক্ত হাদীস গ্রন্থে আরও বর্ণিত ঃ

عَنِ الشَّعْبِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلٰى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا قَالَ الشَّيْبَانِىْ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِىْ مَنْ حَدَّثَكَ بِهٰذَا قَالَ الثِّقَةُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ حَسَنٍ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ اِنْتَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى قَبْرٍ رُطَبٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا قُلْتُ لِعَامِرٍ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ ـ

অনুবাদ ঃ হযরত শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) জনৈক মৃত ব্যক্তির দাফন করার পর কবরের সম্মুখে জানাযার নামায আদায় করলেন এবং এতে চার তাকবীর বলেছিলেন। শায়বানী বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার কাছে এই হাদীস কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য রাবী (বর্ণনাকারী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। এই পর্যন্ত হাসান হতে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলী। কিন্তু ইবনে নুমায়ের (রঃ) তার (জনৈক ব্যক্তি) জানাযার নামায আদায় করলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পশ্চাতে দাঁড়ালেন। আর রাসূল (সাঃ) চার তাকবীর বললেন। আমি আমেরকে জিজ্ঞেস করলাম,এই হাদীসটি তোমার নিকটে কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)।[৬]

৭। আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاِنَّهٗ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَاَلْتُهٗ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا ـ

অনুবাদ ঃ আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যায়দ (ইবনে আরকাম) (রাঃ) জানাযার নামাযে চারবার তাকবীর বলতেন। একবার জানাযায় পাঁচবার তাকবীর বলেছিলেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)ও পাঁচবার বলেছেন।[৭]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসটি মুসলিম শরীফ ছাড়া আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, হযরত যায়দ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সাধারণত জানাযার নামাযে চারটি তাকবীরই বলতেন। কিন্তু একবার পাঁচটি তাকবীর বলায় আমি কারণ জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেনঃ নবী করীম (সাঃ) এই পাঁচটি তাকবীরই বলতেন।

ইবনে আবদুল বার তাঁর اَلْاِسْتِذْرَاكُ কিতাবে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ اَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَثَمَانِيَةً حَتّٰى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِىِّ فَخَرَجَ فَكَبَّرَ

أَرْبَعًا ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى أَرْبَعٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

নবী করীম (সাঃ) জানাযার নামাযে চার, পাঁচ, সাত, আট তাকবীর বলতেন। পরে নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ আসলে নবী করীম (সাঃ) বের হয়ে জানাযার নামায পড়লেন ও তাতে চার তাকবীর বললেন। অতঃপর এই নিয়মের উপরই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল থেকেছেন।

এ হতে বুঝা যায়, প্রথম দিকে জানাযার নামাযে চারটির অধিক তাকবীর বললেও নবী করীম (সাঃ)-এর শেষ ও স্থায়ী নিয়ম হলো চারটি তাকবীর বলা। তাবরানী হাদীসের কিতাবে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর জানাযার নামায রাত দিনে পড়। সে ছোট-বড়, নীচ ও ধনী যে-ই হোক-চার তাকবীর সহকারে।" এটাই নবী করীম (সাঃ) এর শেষ হিদায়েত।

প্রখ্যাত ইমাম শাওকানী লিখিছেন ঃ

وَإِلٰى مَشْرُوْعِيَّةِ الْأَرْبَعِ اَلتَّكْبِيْرَاتُ فِى الْجَنَازَةِ ذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ

জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর বলার বিধি-ব্যবস্থা হওয়াই সর্ব সাধারণ ফিক্‌হবিদদের মত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ "নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবী ও অন্যান্য অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে জানাযা নামাযের এটাই সঠিক নিয়ম। তাঁরা সকলেই জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর দেওয়ার মত পোষণ করতেন।

ইবনে আবদুল বার (রঃ) বলেছেন ঃ

وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَلٰى أَرْبَعٍ

জানাযার নামাযের তাকবীর সম্পর্কে সাহাবীদের মতভেদ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চারটি তাকবীর বলার উপরই তাঁদের এজমা হয়েছে। ইবনে লায়লা ছাড়া কেউই চারটির স্থলে পাঁচটি তাকবীর বলার কথা বলেন নাই।

(নায়লুল আওতার দ্রঃ)।

বিভিন্ন হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফাসহ অধিকাংশ উলামার মাযহাব এই যে, চার তাকবীরে জানাযার নামায। চার

তাকবীরের অধিক যা রাসূল (সাঃ)-এর প্রাথমিক যমানায় ছিল, তা রাসূল (সাঃ)-এর শেষ জীবনে তাঁর এই কার্যক্রম দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। নবী করীম (সাঃ) ইন্তেকালের পর অনুরূপভাবে সাহাবাদের এজমা বা ঐক্যমত দ্বারা পাঁচ তাকবীর মানসূখ হয়ে চার তাকবীর নির্ধারিত হয়। বস্তুত হাদীসের বর্ণনায় হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) যদিও জানাযার নামাযে পাঁচ তাকবীর বলেছেন বটে, কিন্তু তা শুধু একবার ছিল। সুতরাং এর কোন গুরুত্ব নেই। হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, চার তাকবীর বলাই তাঁর অভ্যাস ছিল। "মা'আনিউল আছার" কিতাবে অনুরূপ লিখিত আছে।

৮। প্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেছেন যে, 'চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। কেননা রাসূল (সাঃ) শেষ জীবনে জানাযার নামায চার তাকবীরের সাথে পড়েছেন। সুতরাং এর ফলে পূর্ববর্তী হুকুম মানসূখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। হাকিম ও দারে কুত্নী গ্রন্থে অনুরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জানাযার নামাযের তাকবীরের ব্যাখ্যা কত এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে পরিশেষে চার তাকবীরের উপর সকলের এজমা বা ঐক্যমত হয়েছে। বিভিন্ন ফতওয়ার কিতাবে তা উল্লেখিত হয়েছে।[৮]

তথ্যসূত্র ঃ

১। জামে তিরমিযী শরীফ, মুতারজম উর্দূ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৪৭৮।

২। মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা, বাবুল জানায়েয, হাদীস নং ১৭০।

৩। মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ, মুতারজম উর্দূ, পৃঃ-১৩৫।

৪। মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং-২০৭৪।

৫। মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং ২০৭২।

৬। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৭৮।

৭। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৮৩।

৮। হিদায়া, ১/১৬০ পৃঃ, দুররুল মুখতার, ১/১২২ পৃঃ; শরহে বিকায়া, ১/২৫৩ পৃঃ; নূরুল হিদায়া, ১/২৪৯-২৫০ পৃঃ; বাহরুর রায়েক, ১/১৮৩ পৃঃ; মালাবুদ্দামিনহু, ৯৩ পৃঃ; ফতওয়ায়ে আলমগীরী, ১/১৬১পৃঃ।

সূরা ফাতিহা ব্যতীত জানাযার নামায

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এতে চার তাকবীর বিধিবদ্ধ হয়েছে। জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা বা কোন কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে না। বাস্তবিক পক্ষে তাই হাদীসসম্মত আমল। নিচে এর প্রমাণ পেশ করা হল ঃ

১। তিরমিযী শরীফের 'সালাতুল জানাযার দো'আ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا هَقْلُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَشْهَلِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذٰلِكَ وَزَادَ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَائِشَةَ وَاَبِيْ قَتَادَةَ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَجَابِرٍ -

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ وَالِدِ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوٰى هِشَامُ الدِّسْتِوَائِيْ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَرَوٰى عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ

اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَعِكْرِمَةُ رُبَّمَا يَهِمُ فِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى وَرُوِىَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ اَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِىْ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَشْهَلِىْ عَنْ اَبِيْهِ وَسَاَلْتُهُ عَنْ اِسْمِ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ -

অনুবাদ ঃ হযরত আলী ইবনে হুজ্‌র (রঃ) হযরত আবূ ইবরাহীম আল-আশহালী (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানাযার নামাযে এই দো'আ পড়তেন ঃ অর্থ– "হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করুন। আমাদের যারা জীবিত, যারা মৃত, যারা উপস্থিত, যারা অনুপস্থিত, যারা ছোট, যারা বড়, যারা পুরুষ ও মহিলা, সকলকে।" ইয়াহইয়া বলেন, আমাকে আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান হাদীসটি অনুরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন। অর্থ– "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রেখেছেন, তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখুন। আর যাদেরকে মৃত্যু দিয়েছেন তাদেরকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করুন।" এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আয়েশা, আবূ কাতাদা, জাবির, আওফ ইবনে মালিক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (রহঃ) বলেন, আবূ ইবরাহীম (রঃ)-এর পিতা বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ ও আলী ইবনে মুবারক এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাছীর– আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে নবী (সাঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইবনে আম্মার একে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাছীর– আবূ সালামা– হযরত আয়েশা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইবনে আম্মার (রঃ)-এর রেওয়ায়েতটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়। ইকরিমা অনেক সময় ইয়াহ্ইয়া-এর হাদীস সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পতিত

হন। ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাছীর আবদুল্লাহ ইবনে আবী কাতাদা তাঁর পিতা কাতাদা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাঃ) হতে তা বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (রঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ আল্ বুখারী (রঃ)কে বলতে শুনেছি যে, হাদীসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত হল, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাছীর আবূ ইবরাহীম আল্ আশহালী (রঃ)-এর পিতার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা জানেন না বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

২। উক্ত কিতাবে আরও উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلٰى مَيِّتٍ فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرْدِ وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ اَصَحُّ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ هٰذَا الْحَدِيْثُ ـ

অনুবাদ ঃ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জানাযার নামাযের দো'আ পড়তে শুনেছি। তাঁর দো'আর বাক্যগুলো আমি বুঝতে পারিঃ অর্থ– "হে আল্লাহ! তাকে (মৃত ব্যক্তি) মাফ করুন, তার ওপর রহম করুন এবং তাকে শিশিরের পানি দিয়ে এমনভাবে ধৌত করে দিন যেমনভাবে কাপড় ধৌত করা হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (রঃ) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রঃ) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীসটি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ।[২]

৩। 'মুসনাদে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা' হাদীস গ্রন্থে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْمَيِّتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) যখন জানাযার নামায পড়তেন তখন বলতেন ঃ অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের

জীবিতদের, যারা মৃত, যারা উপস্থিত, যারা অনুপস্থিত, যারা ছোট-বড় এবং পুরুষ ও মহিলা সকলকে মাফ করে দিন।"

অন্য রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত এ বাক্যও রয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

অনুবাদ ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রেখেছেন তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখুন। আর যাদেরকে মৃত্যু দিয়েছেন তাদেরকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করুন। এ ছাড়া আরও কিছু অতিরিক্ত দো'আর বাক্য রয়েছে।'[৩]

৪। বুখারী শরীফের হাদীস ঃ

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَاَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فَقَالَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ ـ

অনুবাদ ঃ তাবিয়ী হযরত তালহা বিন আবদুল্লাহ বিন আওফ (রঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে একটি জানাযার নামায পড়েছি। তিনি এতে সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং বললেন, আমি তা এজন্য পড়লাম যে, যাতে তোমরা জান যে, তা সুন্নাত।[৪]

ইমাম শাফিয়ীর মত তাই, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম সুফইয়ান সাওরীর মতে নবী করীম (সাঃ) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। কোন কোন সাহাবী যে তা পড়েছেন তা দো'আ বা ছানাস্বরূপই পড়েছেন।

প্রখ্যাত আলিম মাওঃ নূর মুহাম্মদ আ'যমী (রঃ) রচিত বংগানুবাদ মিশকাত শরীফের চতুর্থ খণ্ডে উক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৫। জামে তিরমিযীতে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ ـ قَالَ اَبُو

عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِذٰلِكَ الْقَوِيِّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ اَبُوْ شَيْبَةَ الْوَاسِطِيْ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَالصَّحِيْحُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهٗ مِنَ السُّنَّةِ اَلْقِرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাঃ) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। এই বিষয়ে উম্মু শরীক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (রঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। রাবী ইবরাহীম ইবনে উসমান হলেন আবূ শায়বা আল্ ওয়াসিতী। তিনি মুনকারুল হাদীস– তাঁর হাদীস প্রত্যাখ্যাত, বিশুদ্ধ হল ইবনে আব্বাসের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি, তিনি বলেন, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[৫]

৬। উক্ত হাদীস গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهٗ فَقَالَ اِنَّهٗ مِنَ السُّنَّةِ اَوْمِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَخْتَارُوْنَ اَنْ يَّقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيْ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيْ وَغَيْرِهٖ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ ـ

অনুবাদ ঃ তাবিয়ী হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রঃ) হতে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একবার জানাযার নামায আদায় করেন এবং এতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। এই বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তা হল সুন্নাত, অথবা বললেন, তা হল সুন্নাতের পরিপূর্ণতা বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবূ ঈসা (রঃ) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই অনুসারে আমল করেছেন। প্রথম তকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তা ইমাম শাফিয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত।

কতক আলিম বলেন, জানাযার নামাযে কোন কিরআত (সূরা ফাতিহা) পাঠ করা হবে না। এতে কেবল আল্লাহর হাম্দ ও ছানা, নবী (সাঃ)-এর ওপর দুরূদ পাঠ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা। তা ইমাম সওরী ও অন্যান্য কুফাবাসী আলিমগণের অভিমত।[৬]

৭। মিশকাতুল মাসাবীহ্-এর শরাহ তানযীমুল আশতাত ১ম খণ্ডে (উর্দূ) উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, মুজাহিদ, হাম্মাদ, সওরী, শা'বী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আতা', আবূ হুরায়রা, ইবনে উমর, আলী, উমর (রাঃ হুম) প্রমুখ সাহাবী ও ইমামদের নিকটে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা নেই। উপরোক্ত সাহাবী ও ইমামদের দলীল ঐ সকল হাদীস যাতে কেবল মাত্র দো'আ ও ছানা পাঠ করার কথা উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা উল্লেখ নেই।

এই মর্মে আবূ দাউদ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ....

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) জানাযার নামাযে বললেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض كَانَ لَا يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ - رواه مالك فى الموطاء

হযরত মালেক ইবনে উমর (রাঃ) জানাযার নামাযে কিরআত পাঠ করেন নাই। মুওয়াত্তায়ে মালেকে তা বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক (রঃ) জানাযার নামাযে কিরআত পাঠ না করার আমল গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, মদীনায় যেখানে সাহাবী ও তাবিয়ীদের কেন্দ্র ছিল, সেখানেও তাঁরা জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন না। তাছাড়া, পরবর্তীতে কুফায় সাহাবী ও তাবিয়ীগণ জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করার আমল করেন নাই। এই কারণেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রঃ) জানাযার নামাযে কিরআত পাঠ না করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উপরোক্ত কিতাবে এই মর্মে আরও হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ رض اَنَّهُمَا قَالَا لَيْسَ فِى الْجَنَازَةِ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

অর্থাৎ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, জানাযার নামাযে কোরআনের কোন অংশ পাঠ করতে হবে না।

প্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী'তে উল্লেখ হয়েছে যে, জানাযার নামাযে যদি দো'আর নিয়তে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়, তবে কোন দোষের কিছু হবে না। যে সকল হাদীসে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা দো'আ পাঠ করা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে–কিরআত পাঠ হিসেবে নয়।

ইমাম তাহাবী ও ইমাম ইবনে হুমাম অনুরূপ উক্তি করেছেন। তা আইনী শরহে বুখারী, তা'লীক শরহে মিশকাত ও আওজাযুল মাসালিক প্রভৃতি কিতাবে জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ না করার বিষয় উল্লেখ হয়েছে।[৭]

৮। 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী'তে লিখিত জানাযার নামায আদায় করার পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

"প্রথমে নামায শুরুর তাকবীর বলবে, তারপর দ্বিতীয় তাকবীর বলে নবী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পড়বে। তারপর তৃতীয় তাকবীর বলে মুরদাহ এবং মুসলমানদের (জীবিত ও মৃত) জন্য দো'আ পাঠ করবে। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট দো'আ নেই, তবে রাসূলে কারীম (সাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতেন। যথা ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا.....

যদি মুরদাহ নাবালেগ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নিম্নোক্তরূপ দো'আ পড়তে হবে। যথা ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ...... وَمُشَفَّعًا

এই দো'আ পাঠ করবার পর চতুর্থ তাকবীর বলবে এবং সালাম ফিরাবে। চতুর্থ তাকবীরের পর এবং সালামের আগে কোন কিছু পড়তে হবে না। তা শরহে জামে' সগীরে বর্ণিত আছে।

এই নামাযে তাকবীর ব্যতীত সমস্ত দো'আ-দরূদ চুপে চুপে পাঠ করবে। তা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এই নামাযে কোরআন পাঠ করবে না। তবে সূরা ফাতিহা দো'আর নিয়তে পাঠ করলে কোন দোষ নেই। কিরআতের নিয়তে পড়লে জায়েয হবে না। জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোন তাকবীরে হাত উঠাবে না। ইমাম ও মুকতাদি উভয়ের প্রতিই এই হুকুম প্রযোজ্য। তা 'কাফী'র মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। উভয় সালামের মধ্যেই মৃত ব্যক্তির নিয়ত করবে না। বরং প্রথম সালামে ডানের লোকের নিয়ত করবে এবং দ্বিতীয় সালামে বামের লোকের নিয়ত করবে। তা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে।"[৮]

উপরোল্লেখিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে সুষ্ঠু প্রতীয়মান হয় যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা পাঠ করা যাবে না। তবে দো'আ বা ছানার নিয়তে পাঠ করা যেতে পারে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ অনুসারে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

১। জামে' তিরমিযী মুতারজম উর্দূ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৪৭৯।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ-৪৮০।

৩। 'মুসনাদে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা', বাবুল জানায়েয, হাদীস নং ১৯১।

৪। মিশকাতুল মাসাবীহ্, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং ১৫৬৫।

৫। জামে' তিরমিযী মুতারজম উর্দূ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৪৮০।

৬। প্রাগুক্ত পৃঃ-৪৮০-৪৮১।

৭। তানযীমুল আশতাত (উর্দূ), ১ম খণ্ড, পৃঃ-৫১০।

৮। বংগানুবাদ ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৩০৮।

‘কিয়াস’ শরীআতের একটি অকাট্য দলীল

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তব রূপ হল ‘শরীআত’। আর শরীআতের প্রধান উৎস হল কোরআন ও সুন্নাহ। শরীআতী কানূনের আরও দু'টি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ একটি এজমা, অপরটি কিয়াস। সুতরাং কোরআন, সুন্নাহ, এজমা ও কিয়াস– এই চারটি বিষয়বস্তু শরীআতের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত।

‘কিয়াস’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, অনুমান করা, তুলনা করা, সাদৃশ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইত্যাদি। শরীআতের পরিভাষায় কোরআন, হাদীস ও এজমার (ঐক্যমত) সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কল্পে পূর্বের আইন প্রয়োগ করাকে ‘কিয়াস’ বলে। কিয়াস সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় যে ক্ষেত্রে কোরআন, হাদীস ও এজমায়ে সরাসরি সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না।

নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে আল্লাহর ‘ওহী’ আসা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। নবী করীম (সাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি সরাসরি তার সমাধান দিতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরে সে সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায়। উপরন্তু বিশ্বের দিকে দিকে ইসলাম বিস্তৃতি লাভের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন সংকট দানা বেঁধে উঠে। এই প্রেক্ষাপটে সাহাবায়ে কেরাম কোরআন ও হাদীস পূর্ব দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী নতুন নতুন সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছেন বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে। যে সকল ব্যাপারে কোরআন, সুন্নাহ্ ও এজমায় কোন সিদ্ধান্তের উল্লেখ নেই, কিন্তু মূলনীতি আছে, সেই সকল ব্যাপারে কিয়াস প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে যে প্রশ্নে কোরআন-হাদীস নিশ্চুপ এবং এজমা অনুপস্থিত, সে প্রশ্নের তখন সমাধানের প্রয়োজন, তখন তার সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে, সুন্নী মাযহাবের সকল ইমাম সমন্বয়ে বলেন, ঐ সময় সমাধানের জন্য কোরআন, হাদীস ও এজমার আলোকে কিয়াসের মাধ্যমে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত কিয়াস কোরআন ও হাদীসের আইনকে সম্প্রসারণ করে। সুতরাং ইসলামী শরীআতে কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলিম সমাজের কোন কোন মহল কিয়াসকে বিদআত বা নবোদ্ভাবিত বিষয় বলে আখ্যায়িত করে। বস্তুত তা বিদআত নয়।

তা ইসলামী ব্যবস্থায় কিছুমাত্র নতুন জিনিস নয়। স্বয়ং রাসূলে করীম (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন কর্তৃক তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে।

নিচে এর প্রমাণ উপস্থাপন করা হল ঃ

১। মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী শায়খ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) বলেছেন ঃ

وَاَمَّا الْقِيَاسُ وَالْاِجْتِهَادُ فَلَيْسَ مِنَ الْبِدْعَةِ فِىْ شَىْءٍ فَاِنَّهُ مُظْهِرٌ لِمَعْنَى النُّصُوْصِ لَا مُثْبِتٌ لِاَمْرٍزَائِدٍ -

অর্থাৎ কিয়াস ও ইজতিহাদ (গবেষণা বা সামগ্রিক প্রচেষ্টা) কে কোনভাবেই বিদআত বলা যেতে পারে না। কেননা, তা মূল কোরআন-হাদীসের দলীলই প্রকাশিত করে, কোন নতুন অতিরিক্ত জিনিস প্রমাণ করে না।[১]

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফিয়ীর মতে কিয়াস ও ইজতিহাদ শব্দ দু'টির একই ভাবার্থ। যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় যাচাই করে কোরআন-সুন্নাহ হতে শরীআতের মাসআলা বা ফিকহ্ বের করা হয়, সে বিশেষ প্রক্রিয়ার নাম 'ইজতিহাদ'। যিনি ইজতিহাদ করেন তাকে 'মুজতাহিদ' বলা হয়। মুজতাহিদগণ যুগোপযোগী ইসলামের যে কোন সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। আবার মুজতাহিদকে 'ইমাম' বলা হয়। যাঁর সমাধান সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়, তিনিই শরীআতের 'ইমাম' বলে গণ্য হন। অন্যদিকে কিয়াস ও ইজতিহাদ ফিক্‌হের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিয়াসকে ফিক্‌হের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং স্পষ্টতই বলা যায়, কিয়াস শরীআতের একটি অকাট্য দলীল। নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরই কিয়াসের প্রসার ঘটে এবং এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অবশ্য নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ও সাহাবীগণ কোন কোন সময় কিয়াস অনুসারে আমল করেছেন। তাই বলা যায়, কিয়াস কোন বিদআত নয়। নিচে তার প্রমাণ পেশ করা হল ঃ

২। নবী করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের কিছুদিন পূর্বে হিজরী দশম বর্ষে সাহাবী হযরত মুয়ায (রাঃ) কে ইয়ামানে কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় নবী করীম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কিসের মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পাদন করবে? হযরত মুয়ায উত্তরে বললেন, "কোরআন অনুসারে বিচার করব।' নবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "যদি নির্দিষ্ট বিষয়ে কোরআনে সমাধান না থাকে, তবে কি করবে?" তখন তিনি বললেন, "হুযূর (সাঃ)-এর সুন্নাত মুতাবিক বিচার করব।" হুযূর (সাঃ) তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "যদি সুন্নাত হাদীসে তার

সমাধান না থাকে?" মুয়ায (রাঃ) বললেন, اَجْتَهِدُ بِرَأْيِ আমি আমার ব্যক্তিগত কিয়াস বা রায় অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।" তখন আল্লাহর রাসূল মুয়াযের বুকে মৃদু করাঘাত করে বললেন, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দূত দ্বারা এমন উত্তর দেওয়ালেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন।"[২]

সুনানে আবূ দাউদ শরীফে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। নবী করীম (সাঃ) সাহাবাগণকে ইজতিহাদ ও কিয়াস করার জন্য যে উৎসাহ দান করতেন উপরোক্ত হাদীস হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩। উপরোক্ত মর্মে হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, বিচারক যখন ফায়সালা করে, তখন তিনি (প্রয়োজনে) ইজতিহাদ করেন। অতঃপর যখন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, তখন তাঁর জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (রহঃ) বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।[৩]

উল্লেখ্য যে, বুখারী শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) কর্তৃক অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে বিচারের ফায়সালা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَمَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ قَبِيْحٌ (احمد)

অর্থাৎ মুসলিম সমাজ সামগ্রিকভাবে শরীআতের দৃষ্টিতে যা সিদ্ধান্ত করবে, তা আল্লাহর নিকটে ভাল ও উত্তমরূপে গৃহীত হবে এবং মুসলমানগণ যাকে

খারাপ ও জঘন্য মনে করবে, তাই খারাপ ও জঘন্য বলে আল্লাহর নিকট গণ্য হবে। (আহমদ)

ইমাম ইবনুল কাইউম (রহঃ) লিখেছেন যে, "নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ ও কিয়াস করেছেন– এমন অনেক ঘটনাই উল্লেখ হয়েছে। বিশেষত যখন কোন বিষয়ে কোরআন ও হাদীসে শরীআতের মূল দলীল পাওয়া না যাবে, তখন ইজতিহাদ ও কিয়াস করা ছাড়া শরীআত পালনের কোন উপায় থাকে না।[৪]

৫। সাহাবায়ে কেরাম আজমাঈন (রাঃ) নিজেরাও কিয়াস ব্যবহার করতেন। নবী করীম (সাঃ) যখন মৃত্যুশয্যায় তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) নামাযের ইমামতি করেছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের পর সাহাবীগণ হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নামাযের ইমামতির উপর কিয়াস করে বলেছেন, যদি আমরা তাঁকে ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য পছন্দ করতে পারি, তাহলে পার্থিব বিষয়ের জন্য কেন তাঁকে খলীফা নির্বাচন করতে পারব না? হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)কে বলেছেন, "উপমা ও দৃষ্টান্তগুলো জেনে ও বুঝে লও। অতঃপর বিবেচনাধীন সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে তার ওপর কিয়াস কর।" অবশ্য কালের বিবর্তনে সুবিন্যস্তভাবে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্র বিকাশে কিয়াসও একটি বিশেষ তত্ত্বগত রূপ লাভ করে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'রিসালা'তে সর্বপ্রথম কিয়াসের জন্য বিবিধ নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ইমাম শাফিয়ীর পূর্বে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকও ব্যাপকভাবে কিয়াস ব্যবহার করেন। তবে ইমাম শাফিয়ী কোরআন ও হাদীসের দলীল প্রয়োগ করে কিয়াসের প্রামাণিকতা অকাট্যরূপে উপস্থাপন করেন। কিয়াস প্রয়োগ যে শরীআতের অন্যতম উৎস তার প্রতি মুসলিম উম্মাহর এজমা হয়ে গেছে।[৫]

৬। নাসায়ী শরীফ হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

عَنْ طَارِقٍ اَنَّ رَجُلًا اَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَصَبْتَ فَاَجْنَبَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلّٰى فَقَالَ نَحْوًا مِّمَّا قَالَ لِلْاٰخَرِ - يَعْنِىْ اَصَبْتَ

অর্থাৎ হযরত তারিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তির ওপর গোসল ফরয হলে, সে নামায পড়ল না। অতঃপর সে ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর নিকট

উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন ঃ 'তুমি ঠিক কাজই করেছ।"

অতঃপর অন্য এক ব্যক্তির ওপর গোসল ফরয হল। সে তায়াম্মুম করে নামায পড়ল। অতঃপর এই ব্যক্তি এসে নবী (সাঃ)-এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করল। পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে নবী (সাঃ) যা বলেছিলেন, এই ব্যক্তিকেও তিনি তাই বললেন। অর্থাৎ তুমিও সঠিক কাজই করেছ।

ফরয গোসলের জন্য পানি না পাওয়া গেলে কী করতে হবে– প্রথমোক্ত ব্যক্তির জানা ছিল না। তাই সে ব্যক্তি নামায পড়া হতে বিরত থেকেছিল। কারণ মাসআলা অজানা থাকার ফলে সে ব্যক্তির পক্ষে আমল করা সম্ভবপর হয়নি। এজন্যই নবী করীম (সাঃ) তাঁর পদক্ষেপ সঠিক বলে বর্ণনা করেন।

পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার করা ক্ষতিকর হলে ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে কিনা– তা তারও জানা ছিল না। এমতাবস্থায় ওযূর তায়াম্মুমের ওপর কিয়াস করে দ্বিতীয় ব্যক্তি গোসলের স্থলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় ব্যক্তির কিয়াস করার এই প্রয়াস একটি সঠিক পদক্ষেপ ছিল। তাই নবী করীম (সাঃ) তার এ কাজকেও একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সাহাবাগণ নবী (সাঃ)-এর সময়ে কিয়াস করতেন।[৬]

৭। কোরআন শরীফের সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার ন্যায়।

কোরআন পাকের এই আয়াতের অংশ বিশেষ হতে জানা যায় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল। কেননা, আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মের অনুরূপ। অর্থাৎ আদম (আঃ) কে যেমন পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা (আঃ)কেও তদ্রূপ পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, এখানে আল্লাহ তা'য়ালা ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টিকে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির ওপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (মাযহারী দ্রঃ)

৮। কোরআন শরীফও মানুষকে কিয়াস-এর প্রতি উৎসাহিত করেছে, উৎসাহিত করেছে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ ও চিন্তা-গবেষণার প্রতি। আল্লাহ পাকের ইরশাদ ঃ (সূরা হাশর)

فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ

অর্থাৎ হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। এই আয়াতে আল্লাহ পাক কোন বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে কিয়াস বা অনুমান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ (সূরা মুহাম্মদ)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

অর্থাৎ তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশসহকারে চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

ইসলামের প্রথম যুগে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ কোরআন শরীফ ও রাসূল পাক (সাঃ)-এর সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল হতে হয়। প্রাথমিক যুগের খলীফাদের আমলে রাষ্ট্র বিস্তৃতি লাভ করলে ধর্মীয় ও পার্থিব সম্বন্ধীয় সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার প্রয়োজন দেখা দেয়। লোকেরা নতুন মাসআলাসমূহের মীমাংসা করতে কোরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করতে বাধ্য হল।

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরামগণ কোরআন ও হাদীসের আলোকে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতেন। পরবর্তীকালে ইসলামের চার মাযহাবের ইমামগণও কিয়াস প্রয়োগ করে অগণিত সমস্যার সমাধান করেন।

কিয়াসকে ইসলামী শরীআতের দলীল বা উৎস হিসেবে বিবেচনা করা না হলে ইসলাম যে একটি শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা প্রমাণ করা সম্ভব হত না। সুতরাং স্পষ্টত বলা যায় যে, কিয়াস শরীয়াতের দলীল এবং চতুর্থ মৌল উৎস। কোরআন, হাদীস ও যুক্তির কষ্টি পাথরে প্রমাণিত।

৯। ইমাম শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রাঃ) কাযী শুরায়হের নিকট লিখেছিলেন যে, প্রথমে কোন মাসআলা কোরআন শরীফে পেলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো না, আর এতে না পেলে হাদীসের অনুসরণ কর। আর এতে না পেলে নিজ মতে কিয়াস কর। আরও ইমাম শা'বী হযরত উমর

(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হাদীসের পরে মুসলমানগণের এজমা মান্য কর, অভাবে কিয়াস করতে পার।[৭]

১০। ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী (রহঃ) লিখেছেন, যা বহুসংখ্যক মুজতাহিদগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন, তাই দলীল হবে। নিশ্চয়ই সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও শহরসমূহের ফকীহগণ কিয়াস করেছেন।[৮]

১১। 'এনসাফ' নামক কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যদি কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হতেন, তবে কোরআন অনুযায়ী হুকুম করতেন, যদি হাদীসে না থাকে, তবে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরের মতানুযায়ী হুকুম করতেন। যদি না থাকে, তবে কিয়াস করতেন।[৯]

১২। 'গায়াতুল আওতার' নামক কিতাবে আছে ঃ

سنت سے قول اور فعل اور تقریر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے - تقریر اس سے عبارت ہے کہ کوئی امر حضرت کے سامنے ہو اور حضرت نے اسکو جائز رکھا اس پرانکار نہ کیا اور صحابہ کرام کے اقوال تو سنت میں داخل ہے اور اجماع سے مراد ان لوگونکا اجماع ہے جنکے اجماع شمار کے لائق ہے چنانچہ صحابہ کرام اور تمام مجتہدین عصرکا اتفاق اور تعامل ناس یعنی لوگونکا عمل رائج ہو تو اجماع کا تابع ہے اور قیاس سے مراد وہ قیاس ہے جو کتاب اور سنت اور اجماع سے مستنبط ہو۔

অর্থাৎ হযরত রাসূল (সাঃ)-এর কাজ, কর্ম ও যে কাজ রাসূল (সাঃ)-এর সম্মুখে হয়েছে এবং তিনি তা সমর্থন বা অনুমোদন করেছেন– নিষেধ করেন নাই, তাই হাদীস। সাহাবীগণের উক্তিও হাদীসের মধ্যে গণ্য।

এজমা বলতে যে সকল আলেমদের এজমা বুঝতে হবে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম, মাননীয় মুজতাহিদগণ এবং তাআমুলে নাস বা সর্ব সাধারণ মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত আমল যা শরীআতের আলিমগণ নিষেধ করেন নাই। তাও এজমার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ এবং এজমা হতে যা বের হয়েছে, তাই কিয়াস।[১০]

১৩। ইমাম নববী (রহঃ) 'তাহযীবুল আসমা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইমামুল হারামাইন বলেছেন, "বিচক্ষণবিদ্বানগণের 'মত' এই যে, কিয়াস অমান্যকারীগণ উম্মতের আলিম ও শরীআতের বাহক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতে পারে না।"

'ইকদুল জিদ' গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, "খারেজী দলকে কাযী করা জায়েয নয়, যেহেতু তারা এজমা অমান্য করে, শিয়া দলকে কাযী করাও জায়েয নয়, যেহেতু তারা কিয়াস অমান্য করে।"

কামিউল মুবতাদেয়ীন কিতাবে মাওঃ রূহুল আমীন (রহঃ) বলেন, খারিজী, শিয়া, মু'তাযিলা ও মরজিয়া এই ভ্রান্ত দলগুলো এজমা ও কিয়াস অমান্য করে থাকে। মাযহাববিদ্বেষীগণ উক্ত মতাবলম্বন করলে 'সুন্নাত জামাআত' হতে খারিজ হয়ে যাবে।[১১]

১৪। মুহাম্মাদী বা আহ্লে হাদীস মৌঃ সিদ্দীক হাসান সাহেব 'রওজা নাদিয়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

فَيُقَالُ اَدِلَّةُ الشَّرْعِ اَرْبَعَةٌ اَلْقُرْاٰنُ وَالْحَدِيْثُ وَالْاِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ

শরীআতের চারটি দলীল– কোরআন, হাদীস, এজমা ও কিয়াস।

মুহাম্মাদীগণের 'তাকভিয়াতুল ঈমান' পুস্তকের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে ঃ

تو یسی بات پر مجتہدون کے قیاس صحیح کے موافق
عمل کرنے پر وہ مجتہد بھی ایسا ہوکہ جس کا اجتہاد امت
کے اکثر عالم مسلمانوں نے قبول کیا جیسی امام اعظم اور
امام شافعی اور امام مالك اور امام احمد رح

অর্থাৎ কোরআন হাদীস ও এজমায়ে যে কোন মাসআলা প্রমাণিত না হয়, উক্ত মাসআলায় ইমাম আ'যম, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ

(রহঃ)-র কিয়াসী সিদ্ধান্ত মান্য করতে হবে। কেননা জগতের অধিকাংশ আলিম তাঁদের মাযহাব মান্য করেছেন।

উপরোক্ত পুস্তকের ঈমান অধ্যায়ের ৩ পৃষ্ঠায় আরও উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مجتہدوں سے اپنے اجتہاد سے نکالا وہ بھی سنت میں داخل ہے۔

অর্থাৎ মুজতাহিদগণের কিয়াসী মাসআলাও নবীর সুন্নাতের মধ্যে গণ্য হবে।[১২]

১৫। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ) কোরআন, হাদীস ও এজমা অনুসরণে কিয়াস করে সহস্রাধিক মাসআলা ইসতিম্বাত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাঁকে 'আহলুর রায়' ও কেয়াসকারী বলা হয়ে থাকে। এ কোন অপবাদ নয়, বরং সত্য কথা বলা হয়।

ইমাম শায়বানী মালিকী বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইমাম আ'যমকে কোরআন হাদীসের বিরুদ্ধে কিয়াস ও রায়দানকারী বলবে, সে ব্যক্তি শত্রু, অজ্ঞান, হতভাগা ও অভিশাপগ্রস্ত হবে।"

কোরআন হাদীস এবং শরীআতে যে যে দলীল নির্ধারিত হয়েছে অর্থাৎ এজমা ও কিয়াস, এই চতুষ্টয় হতে আবিষ্কৃত মাসআলাসমূহকে ফিক্‌হ বলে। এই ফিকহ্-তত্ত্ববিদগণের দু'শ্রেণী হয়েছে– আহলে রায় ও আহলে কিয়াস। আহলে হাদীসগণ কোরআন ও হাদীস মান্য করে থাকেন, সেইরূপ আহলে রায়গণ কোরআন ও হাদীস মান্য করে থাকেন। আরও যেরূপ আহলে রায়গণ কোরআন ও হাদীসে কোন মাসআলা পেলে কিয়াস করে থাকেন, সেরূপ আহলে হাদীসগণও এরূপ ক্ষেত্রে কিয়াস করে থাকেন। 'আহলে রায়'-এর অর্থ ইজতিহাদশক্তিসম্মত ইমামগণ। যে ইমামগণ কোরআন ও হাদীসের মহাতত্ত্বদর্শী, কোরআন, হাদীস, এজমা ও কিয়াস হতে আহকাম প্রকাশ করার শক্তি রাখেন, তাঁরাই 'আহলে রায়' হবেন।

রবিয়া ইবনে আবী আবদির রহমান, সুফইয়ান সওরী, মালেক ইবনে আনাস, আওযায়ী, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রভৃতি সিহাহ্সিত্তার প্রণেতাগণ আহলে রায় ছিলেন। আরও সাহাবা, তাবিয়ী ও তাবে' তাবেয়ীগণ রায় ও কিয়াস করে অবস্থা বিশেষে শরীআতের ব্যবস্থা বিধান করেছেন। কাজেই যিনি যে পরিমাণ রায় ও কিয়াস করেছেন, তাকে সে পরিমাণ আহলে রায় ও কিয়াসকারী বলা সংগত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবলমাত্র ইমাম আ'যমকে আহলে রায় ও কিয়াসকারী বলে দুর্নাম রটনা করা হয়ে থাকে।[১৩]

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে أُولِى الأَبْصَارِ বিচক্ষণ জ্ঞানী মানবসমাজকে কিয়াস করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর রাসূলে পাক (সাঃ) সাহাবীগণের শরীআত সম্পর্কিত বিবিধ কিয়াসকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেছেন। সুতরাং কিয়াস নতুন সৃষ্ট কোন বিষয় নয়, বরং তা কোরআন, সুন্নাহ ও এজমা হতে গৃহীত অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত। এজমা ও কিয়াসের বুনিয়াদ কোরআন ও সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফিয়ী (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মুজতাহিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে শরীআতের বহু বিষয়ে ফয়সালা দান করেছেন।

অতএব, 'কিয়াস' শরীআতের একটি অকাট্য বা মৌলিক দলীল। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১। মাকতুবাতে রব্বানী, দ্বিতীয় দফতর।

২। জামে' তিরমিযী, বাবুল আহ্‌কাম, হাদীস নং ১২৬৬।

৩। প্রাগুক্ত, ১২৬৫।

৪। যাদুল মা'আদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৬২৪।

৫। উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-১৬৯।

৬। নাসায়ী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৪৯ (হাশিয়ায়ে ইশফাকী)।

৭। ফতহুল বারী-১৩/২২৪/২২৫।

৮। প্রাগুক্ত-১৩/২৩২।

৯। কামিউল মুবতাদেয়ীন, প্রণেতা, মাওঃ রূহুল আমীন বসিরহাটী।

১০। ফতওয়ালে সিদ্দীকিয়া, প্রণেতা, মাওঃ শাহসূফী নিসার উদ্দীন আহমদ, পৃঃ-২২৫-২২৬।

১১। কামিউল মুবতাদেয়ীন, প্রণেতা, মাওঃ রূহুল আমীন বসিরহাটী।

১২। সাইফুল মুকাল্লিদীন, প্রণেতা, মাওঃ ইবরাহীম মুহাব্বাতপুরী, পৃঃ-২২০-২২১।

১৩। কামিউল মুবতাদেয়ীন, প্রণেতা, মাওঃ রূহুল আমীন বসিরহাটী, পৃঃ-২৫, ২৬, ৫৯।

'তাকলীদ' প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক

'তাকলীদ' শব্দের অর্থ অন্যের আদেশ-নিষেধ, কথা, মতবাদ, চিন্তাধারা ও আদর্শকে নির্দ্বিধায় মেনে চলা। ফিক্হশাস্ত্রের মূল নীতিমালা অর্থাৎ কোরআন, হাদীস, এজমায়ে উম্মত ও সহীহ্ কিয়াসের ভিত্তিতে ইসলামী শরীআতের মহাজ্ঞানের অধিকারী মাযহাবের ইমামগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যা-ব্যবস্থাদি দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তম ধারণায় মান্য করে চলাকে 'তাকলীদ' বলা হয়।

কোন স্থানে কী ব্যাখ্যা করতে হবে এবং কোন্ অর্থ কোথায় প্রযোজ্য হবে, মুসলিম পণ্ডিত ও গবেষকগণ তা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীস হতে নিঃসৃত ও গৃহীত মুসলিম বিদ্বানমণ্ডলী কর্তৃক গবেষণামূলক অভিমত মেনে লওয়াকে শরীআতের পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলা হয়।

পাক-ভারত ও বাংলাদেশে 'আহলে হাদীস' নামে একটি ধর্মীয় দল আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তাকলীদকে অবৈধ (নাজায়েয) বলে প্রচার করে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তারা তাকলীদ মেনে চলে। এই সম্প্রদায়ের অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাদের আলিমদের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ মেনে চলে। বাস্তবক্ষেত্রে এইই 'তাকলীদ'।

প্রকৃতপক্ষে মূর্খ, নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিত মানুষের পক্ষে সরাসরি কোরআন ও হাদীস হতে হুকুম-আহকাম আহরণ করা অসম্ভব। এমনকি বর্তমান যুগের অনেক আলিমগণের পক্ষেও কোরআন ও হাদীস হতে গবেষণা করে মাসআলা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এ জন্যেই তাবেয়ীন ও তাবে'তাবেয়ীনের মধ্যে বিশিষ্ট ইমাম ও মুজতাহিদগণ কোরআন-হাদীস হতে শরীআতের হুকুম-আহকাম ও মাসআলা তন্নতন্ন করে নির্ণয় করেছেন এবং ফিকহ্শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। যদি শরীআতের এ সকল মূলনীতি ও মাসআলা ফিকহশাস্ত্রে সবিস্তারে লেখা না হত, তবে এ যুগে কোরআন ও হাদীস যথাযথভাবে আমল করা কারও পক্ষে সম্ভব হত না। অতএব, সাম্প্রতিক কালে চার মাযহাবের চার ইমামের যে কোন এক জনের তাকলীদ (অনুসরণ) করা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব।

নিচে এর দলীলাদি উপস্থাপন করা হল ঃ

১। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা না জান তবে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞেস করে লও।[১]

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) ও উলিল আমরগণের অনুসরণ কর।[২]

উলিল আমরের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কবীরে লিখিত আছে ঃ

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اُوْلِى الْاَمْرِ اَلْعُلَمَاءُ الَّذِيْنَ يُفْتُوْنَ فِىْ اَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ وَيُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ وَ هٰذَا رَايَةُ الثَّعْلَبِىْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلُ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ -

অর্থ ঃ যে সকল উলামা শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে মীমাংসা করেন এবং জনগণকে দ্বীন শিক্ষা দেন তাঁরাই উলিল আমর'। তা ছা'লাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হাসান, মুজাহিদ ও দাহ্হাকেরও একই অভিমত। মাআরেফুল কোরআনে অনুরূপ লিখিত আছে।[৩]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিজ্ঞ আলিম ও ইমামদের অনুসরণ করার জন্য মুসলমানগণের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফিক্হশাস্ত্রের পরিভাষায় এই অনুসরণের নামই হল 'তাকলীদ'।

২। দারমী শরীফে بَابُ الْاِقْتِدَا بِالْعُلَمَاءِ তে বর্ণিত আছে যে, "হযরত আতা বইনে রিবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোরআন শরীফের সূরা নিসা-এর উক্ত আয়াত উল্লেখ করে বলেন, "তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে যাঁরা 'উলিল আমর' তাদেরও

অনুসরণ কর।" হযরত আতা (রহঃ) বলেন, উলিল আমর এর মর্ম ফকীহগণ। বিজ্ঞ আলিমগণ তা হতে প্রমাণ করেন যে, চার ইমাম থেকে কোন একজনের তাকলীদ করা আবশ্যক।[৪]

৩। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَا اَدْرِىْ مَا بَقَائِىْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ -

অর্থ ঃ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি জানি না কতদিন আমি তোমাদের মাঝে থাকব। সুতরাং আমার পরে তোমরা (হযরত) আবূ বকর (রাঃ) এবং (হযরত) উমরের অনুসরণ করিও।[৫]

সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একজন খলীফার আনুগত্য ও অনুসরণ করার নির্দেশ নবী করীম (সাঃ) দিয়ে গেছেন। তাকেই ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ করা বলা হয়।

৪। উপরোক্ত হাদীসের কিতাবে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ اَصْحَابِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاهْتَدُوْا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَ تَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ وَ فِىْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ مَا حَدَّثَكُمْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدِّقُوْهُ بَدْلَ وَ تَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ اِبْنِ اُمِّ عَبْدٍ -

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আমার পর তোমরা আমার সাহাবীদের মধ্য হতে এ দুজনের– আবূ বকর (রাঃ) ও উমরের অনুসরণ করিও। আম্মার (রাঃ)-এর চরিত্র অবলম্বন করিও এবং ইবনে উম্মে আবদের (ইবনে মাসউদ)র নির্দেশ দৃঢ়তার সাথে মেনে চলিও।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় وتمسكوا بعهد ابن ام عبد এর পরিবর্তে রয়েছে, "ইবনে মাসউদ তোমাদেরকে যা কিছু বর্ণনা করেন, তোমরা তাকে সত্য বলে জানিও।"[৬]

আরও এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اسْتَخْلَفْتَ قَالَ اِنْ اِسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوْهُ عُذِّبْتُمْ وَلٰكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوْهُ وَمَا اَقْرَئَكُمْ عَبْدُاللّٰهِ فَاقْرَءُوْهُ ـ

অর্থ ঃ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি (আপন জীবদ্দশায়) একজন খলীফা নিযুক্ত করতেন। তখন তিনি বললেন, আমি যদি কাউকেও তোমাদের ওপর খলীফা নিযুক্ত করি, আর তোমরা তার বিরোধিতা কর, তাহলে তোমরা শাস্তি ভোগ করবে। (একটি কথা স্মরণ রাখিও,) হুযায়ফা তোমাদেরকে যা বলে, তা সত্য মনে করিও এবং আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যা কিছু তোমাদেরকে পড়ায়, তোমরা তা পড়।[৭]

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে ঃ

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْبِهَا وَعُضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (مسند احمد)

এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত সত্যপন্থী খলীফাদের সুন্নাত। তোমরা তা মজবুত করে ধরবে, দাঁত দিয়ে কামড়ায়ে ধরে স্থির হয়ে থাকবে।[৮]

সুতরাং এ সমস্ত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ বা তাকলীদ করা বৈধ।

৫। বুখারী ও আবূ দাউদ শরীফে উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَتَانَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَاَمِيْرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ اِبْنَةً وَاُخْتًا فَقَضٰى لِلْاِبْنَةِ بِالنِّصْفِ وَلِلْاُخْتِ النِّصْفِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ

(كتاب الفرائض)

অর্থ ঃ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ হযরত মু'য়ায (রাঃ) দ্বীনী আহ্কামের শিক্ষক এবং গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ইয়ামন প্রদেশে আগমন করেন। আমরা তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করি যে, একটি কন্যা ও বোন রেখে এক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছেন। তার সম্পদ কিভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হবে? তখন হযরত মুয়ায (রাঃ) এই নির্দেশ দিলেন যে, কন্যা ও বোন উভয়কে অর্ধাংশ হারে মৃত ব্যক্তির সম্পদের মালিক হবে। তখন রাসূল (সাঃ) জীবিত ছিলেন।[৯]

হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীমের জীবদ্দশায়ই তাকলীদ প্রচলিত ছিল।

৬। বুখারী, তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَبِيْلَ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ مُخْتَرِهٖ قَالَ سُئِلَ اَبُوْمُوْسٰى ثُمَّ سُئِلَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَخْبَرَ بِقَوْلِ اَبِىْ مُوْسٰى مُخَالِفَهٗ ثُمَّ اَخْبَرَ اَبُوْمُوْسٰى بِقَوْلِهٖ فَقَالَ لَا تَسْئَلُوْنِىْ مَا دَامَ هٰذَا الْبَحْرُ فِيْكُمْ -

অর্থ ঃ হযরত হুযাইল ইবনে শুরাবীল হতে বর্ণিত এই হাদীসটি সুদীর্ঘ। এর সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এই যে, হযরত আবূ মূসা (রাঃ)কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়। আবার তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকেও জিজ্ঞেস করা হয় এবং আবূ মূসা (রাঃ) প্রদত্ত ফতওয়ার কথাও তাকে অবহিত করা হয়। তখন হযরত ইবনে মাসউদ হযরত আবূ মূসা কর্তৃক প্রদত্ত ফতওয়ার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। অতঃপর এই বিষয়টি হযরত আবূ মূসার নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ যতদিন তোমাদের মাঝে এই বিদ্যার সাগর (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ) জীবিত থাকবেন, ততদিন তোমরা আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করো না।[১০]

উক্ত হাদীস হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইবনে মাসউদের জীবদ্দশার প্রতিটি মাসআলা তাঁরই নিকট জিজ্ঞেস করা হত। এটাই তাকলীদে শাখ্সী বা ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ।

৭। বুখারী শরীফে লিখিত আছে ঃ

عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَأَلُوْا اِبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ اِمْرَاةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوْا لَا نَاْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ

إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَاسْئَلُوْا فَقَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلُوْا فَكَانَ فِيْمَنْ سَأَلُوْا أُمَّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيْثَ صَفِيَّةَ

অর্থ ঃ হযরত ইকরিমা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ হজ্জের সময় ফরয তাওয়াফ আদায় করার পর যদি কোন মহিলার হায়েয শুরু হয়, তখন তার করণীয় কী? এ বিষয়ে মদীনাবাসী সাহাবাগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, সে মহিলা চলে যাবে অর্থাৎ ফরয তওয়াফ আদায়ের পর বিদায়ী তওয়াফ-এর পূর্বে যদি কোন মহিলার হায়েয শুরু হয় তবে বিদায়ী তাওয়াক করতে হবে না। তখন মদীনাবাসীগণ বললেন, আমরা আপনার অভিমত গ্রহণ করে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর অভিমত পরিত্যাগ করতে পারি না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমরা যখন মদীনায় যাবে, তখন তা জিজ্ঞেস করে নিবে। অতঃপর তাঁরা মদীনায় গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে উম্মে সুলায়ম তখন হযরত সুফিয়ার হাদীস উল্লেখ করেছিলেন।[১১]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফতহুল বারী'তে মদীনাবাসীদের এ উক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে ঃ

أَفْتَيْتَنَا أَوْلَمْ تُفْتِنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِقَوْلِ لَا تَنْفِرُ -

অর্থ ঃ আপনি আমাদেরকে ফতওয়া প্রদান করেন আর না করেন, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত বলেছেন, হায়েয আক্রান্ত মহিলা তাওয়াফ আদায় করা ব্যতীত ফিরে যেতে পারবে না।

ফতহুল বারীতে উল্লেখ আছে ঃ

فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُتَابِعُكَ يَاابْنَ عَبَّاسٍ وَاَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا فَقَالَ سَلُوْا مَا جِئْتُمْ اُمَّ سُلَيْمٍ -

অর্থ ঃ আনসারগণ বললেন, হে ইবনে আব্বাস! আপনি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিতের বিরোধিতা করতেছেন। সুতরাং আমরা আপনার অনুসরণ করব না। অতঃপর ইবনে আব্বাস বললেন, তোমরা (মদীনায়) যেয়ে হযরত উম্মে সুলায়মকে জিজ্ঞেস করিও।[১২]

এই সকল প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানা গেল যে, মদীনার আনসার সাহাবাগণ হযরত যায়েদ বিন ছাবেতের প্রতি নির্দ্বিধায় তাকলীদ করতেন। আরও জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাস আনসারদের কথায় প্রতিবাদ করলেন না, বরং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিতের নিকটে যেয়ে মাসআলা অনুসন্ধানের কথা বললেন। সুতরাং তাকলীদ সাহাবাগণের যুগেও বিদ্যমান ছিল।

৮। সাহাবাগণের 'তাকলীদ' করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেছিলেন ঃ

خُذُوْا مِنَ الرَّأيِ مَايُوَافِقُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا اَعْلَمَ مِنْكُمْ

অর্থাৎ তোমরা ঐ অভিমত গ্রহণ কর, যা তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের অনুকূল। কেননা তাঁরা তোমাদের চেয়ে বেশী বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ছিলেন।[১৩]

এই কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাকলীদের প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব, সাম্প্রতিক কালে চার ইমামের যে কোন একজনের তাকলীদ করা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব।

৯। يَنْبُوْعُ (ইয়াম্‌বু') নামক গ্রন্থে মাওঃ আবদুল হক লিখেছেন ঃ

وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْإِجْتِهَادِ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيْدُ سَوَاءٌ كَانَ عَامِيًّا صَرْفًا اَوْ عَالِمًا بِبَعْضِ عُلُوْمِ الْإِجْتِهَادِ -

অর্থ ঃ ইজতিহাদ (গবেষণা) করার যোগ্যতা যার নাই, অন্য কোন মুজতাহিদের (গবেষক) তাকলীদ করা তার জন্য অত্যাবশক। ইজতিহাদ করার মত সম্যক জ্ঞানের অভাব থাকলে যে কোন অবস্থায়ই তাকে অন্যের অনুসরণ করে চলতে হবে।[১৪]

১০। আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম 'ফত্‌হুল কাদীর' কিতাবে লিখেছেন ঃ চার ইমামের বিপরীত কোন মাযহাব (চলার পথ) এর অনুসরণ করা যাবে না বলে বিজ্ঞ আলিমদের এজমা (সমবেত মত) হয়েছে।[১৫]

১১। মোল্লাজিওন তাঁর তাফসীরে আহমদী, কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর তাফসীরে মাযহারী এবং শাহওয়ালী উল্লাহর ইকদুল জীদ কিতাবে লিখেছেন ঃ সমবেত মতে শুধু চার ইমামের যে কোন একজনের তাকলীদ বা অনুসরণ করতে হবে।[১৬]

১২। 'ইয়ামবু' নামক গ্রন্থে মাওলানা আবদুল হক মুহাজিরে মক্কী উল্লেখ করেছেন ঃ

فَإِنَّهُمْ (اَلْاَئِمَّةُ الْاَرْبَعُ) الَّذِيْنَ اشْتَهَرَتْ اِمَامَتُهُمْ وَتُقِرُّ طَرِيْقَتُهُمْ وَخَبَتْ مَذَاهِبُهُمْ وَانْتَشَرَتْ اِتِّبَاعُهُمْ -

অর্থ ঃ কেননা (৪ ইমাম) যাঁরা ইমাম হিসাবে বিখ্যাত, যাঁদের বর্ণিত অভিমত ও তরীকা প্রতিষ্ঠিত ও বিধিবদ্ধ এবং যাদের অনুসারীবৃন্দ দুনিয়াব্যাপী, অবশ্যই তাঁরা অনুসরণীয়।[১৭]

১৩। 'ফতওয়ায়ে জালালুদ্দীন সুয়ূতী' নামক কিতাবে লিখিত আছে ঃ

اِعْلَمْ اَنَّ انْحِصَارَ الْمَذَاهِبَ فِى الْاَرْبَعَةِ الْمَعْلُوْمَةِ اِنَّمَا كَانَتْ بَعْدَ الْخَمْسِ مِائَةٍ بِسَبَبِ مَوْتِ الْعُلَمَاءِ وَقُصُوْرِهِمْ

অর্থঃ জেনে রাখা উচিত যে, আলিমের মৃত্যু এবং তাঁদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে হিজরী পঞ্চাশ শতাব্দীর পর মাযহাবের সংখ্যা চারটিতে এসে সীমিত হয়।[১৮]

১৪। হাদায়েকে হানাফিয়া গ্রন্থে হাশিয়ায়ে তাহতাবী হতে বর্ণিত আছে ঃ

بعض مفسروں نے کہا ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا چار مذاہب یعنی حنفی ومالکی وشافعی وحنبلی پر جمع ہواہے اور جو شخص ان چار مذاہب سے خارج ہے وہ اہل بدعت اور ناری ہے

অর্থ ঃ কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন ঃ হানাফী, মালেকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী এই চার মাযহাবের লোক মুক্তির অধিকারী– আহলে সুন্নাত দলভুক্ত। যারা এ চার মাযহাবের বহির্ভূত, তারা বিদআতী ও জাহান্নামী।[১৯]

১৫। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

فَقَدْ صَرَّحَ فِى التَّحْرِيْرِ اَنَّ الْاِجْمَاعَ اِنْعَقَدَ عَلٰى عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَذَاهِبِ مُخَالِفِ الْاَرْبَعِ لِاِنْضِبَاطِ مَذْهَبِهِمْ وَانْتِشَارِهَا وَكَثْرَةِ اِتِّبَاعِهَا -

অর্থ ঃ তাহরীর নামক কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, চার মাযহাবের বিরোধী পঞ্চম কোন দল বা মাযহাব অনুসারে আমল করা অবৈধ– এ সম্পর্কে এজমা হয়েছে। কারণ ৪টি মাযহাব সুসংহত ও বিধিবদ্ধ। এ মাযহাবগুলো খুবই বিস্তার লাভ করেছে এবং এদের অনুসারীর সংখ্যাও অত্যাধিক।[২০]

১৬। তাফসীরে বায়যাবীর ১/২০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, "মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা অকাট্য ওয়াজিব।" আরও ২০৯/২১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, "পয়গম্বর ও ইমামগণের অনুসরণ করা প্রকৃতপক্ষে কোরআন শরীফের অনুসরণ করা।" তাফসীরে কবীরের ৩/১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, কোরআন শরীফের সূরা নিসার اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে বিদ্বানগণের (মুজতাহিদগণ) তাকলীদ করা ওয়াজিব।[২১]

১৭। মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ বা অনুসরণ করা অন্যদের ওপর ওয়াজিব। এ বিষয়ের ওপর তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন'– এর পঞ্চম খণ্ডে আল্লামা 'মুফতী শফী' (রহঃ) লিখেছেন ঃ "সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতের অংশ বিশেষ– فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ 'অতএব, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে' বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কোরআনী বর্ণনা ভংগির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথা মত কাজ করা জ্ঞানহীনদের ওপর ফরয হবে। একেই তাকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তাকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তাকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলেম নয়,

আলেমদের কাছ থেকে ফতওয়া নিয়ে কাজ করবে। বলাবাহুল্য, আলিমেরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলেমদের ওপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার কোন নির্দেশকে শরীআতের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই 'তাকলীদ'। এ তাকলীদ যে বৈধ বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই।

এ কারণেই আলিম, মুহাদ্দিস ও ফিক্‌হবিদগণ, ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী, তিরমিযী, তাহাবী, ইবনে হুমাম, ইবনে কুদামা এবং এ শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম আরবী ভাষা ও শরীআত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদেরকে তাকলীদ করে গিয়েছেন। তাঁরা সকলেই ইমামের বিপরীতে নিজ মতে কোন ফতওয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেনি।"[২২]

১৮। মোল্লাজিওন তাঁর তাফসীরে আহমাদী, আল্লামা আবদুল হাই লাখ্‌নবী তাঁর গওসুল আ'যম আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি তাঁর তাফসীরে মাযহারী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী তার ইকদুলজীদ কিতাবে লিখেছেন, সমবেত মতে এটাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, শুধু চার ইমামের চার মাযহাবকে অনুসরণ করা জায়েয। অতএব, তাঁদের বিরোধী নতুন কোন মুজতাহিদের অনুসরণ করা জায়েয নয়।[২৩]

১৯। মাযহাব ও তাকলীদ গ্রন্থে মাওঃ নিসারউদ্দীন লিখেছেন ঃ

الحاصل ائمة مجتهدين كى تقليد واتباع بامر الله سبحانه وتعالى هے اور اطاعت انكى اطاعت امر الله سبحانه وتعالى هے اور انكى اطاعت عبادة الله سبحانه وتعالى هے سو عوام مومنين كو اور جسكوا رتبۂ اجتهاد نهير هے ائمه مجتهدين كى تقليد واتباع لازم وفرض هے

অর্থ ঃ বস্তুত মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদ এবং তাঁদের অনুসরণ করার আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ রয়েছে। তাঁদের অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অনুসরণ এবং ইবাদাতের মধ্যে গণ্য। সুতরাং সাধারণ মুসলিম এবং যেসব মানুষের

ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই, তাদের সকলের জন্য মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদ করা অত্যন্ত জরুরী এবং ফরয।[২৪]

২০। মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা শীর্ষস্থানীয়। 'কাশফুয যনুন' এর ২য় খণ্ডে ২০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, "যে প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর সত্যতা জ্ঞাণীগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে, তা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই চতুষ্টয়ের চার মাযহাবের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও উত্তম। যেহেতু তিনি তাঁদের মধ্যে দক্ষতা, তীক্ষ্ণ মেধা, মাসআলা সিদ্ধান্তে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কোরআন হাদীসের সমধিক অভিজ্ঞতা ও আহকাম সংক্রান্ত বিদ্যায় ন্যায্য মত প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করেছিলেন।[২৫]

২১। তাহরীর কিতাবে উল্লেখ হয়েছে যে, চার মাযহাবের বিপরীত কোন মাযহাবের প্রতি আমল জায়েয না হওয়ার এজমা হয়েছে।

তাহতাবী ৪র্থ খণ্ডে লিখিত আছে, "এই নাজি সম্প্রদায় (সুন্নাতুল জামাআত) বর্তমানে চার মাযহাবে সমবেত হয়েছে– হানাফী, শাফিয়ী, মালেকী ও হাম্বলী। যে ব্যক্তি এ চার মাযহাব হতে খারিজ হয়, সে ব্যাক্তি বিদআতী ও দোযখী।"[২৬]

২২। হাদায়েকে হানাফিয়া কিতাবে উল্লেখ হয়েছে ঃ

اور یے جوائمہ اربعہ کے مقلدین اپنے ائمہ کیطرف منسوب هوکر حنفی مالکی شافعی حنبلی کے نام سے مشهور هیں اسکا مطلب صرف یهی هے کہ انکو ایك ودوسرے سے امتیاز حاصل هو ورنہ واقع میں هریك فرقہ محمدی هے اور انکا اپنے امام کے مسلك پر چلنا اور انکی تقلید کرنا عین طریقئہ نبویہ پر چلنا هے جو شخص اس منسب سے عار کرتاهے اور شریعت کے مخالف سمجهتا هے وہ خود گمراہ هے اور لوگوں کو گمراہ کرتاهے ۔

অর্থাৎ ইমাম চতুষ্টয়ের মুকাল্লিদ (অনুসারী) লোকগণ স্ব-স্ব ইমামের নামানুসারে হানাফী, মালেকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী বলে কথিত হবার কারণ এই যে, তা মাযহাব চতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক নামকরণ হয়েছে। মূলত সকলেই মুহাম্মদী অর্থাৎ হযরত (সাঃ)-এর অনুগামী এবং নিজ নিজ ইমামের তাকলীদ করত তাঁদের অনুসরণ করাই প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ করা। ইমামগণের সাথে এই সম্বন্ধকে যারা দোষারোপ করে এবং তা শরীআতের বহির্ভূত বলে ধারণা করে তারা নিজেরাও ভ্রান্ত এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করে।[২৭]

২৩। উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণের মধ্যে যে কোন একজনের তাকলীদ বা মতানুসরণ করা ওয়াজিব। শরীআতে এর গুরুত্ব এরূপ যে, মানিত এক মাযহাব পরিত্যাগ করে অন্য মাযহাবে যাওয়া কারও পক্ষে জায়েয নেই।

'তাফসীরে আহ্মদীতে মোল্লাজিওন (রহঃ) উল্লেখ করেছেন ঃ "যদি বলতে চাও যে, মাযহাব চতুষ্টয়ের একটির সাথে অপরটির মতভেদ আছে। এই মতভেদ সম্বলিত মাযহাবগুলোর মধ্যে মাত্র যে কোনও একটি সত্য হবে। সবগুলোই সত্য কিরূপে সম্ভব? এর উত্তর এই যে, যেখানে মতভেদ আছে সেখানে একটি সত্য, অর্থাৎ যা ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেছেন, তাই সত্য। কিংবা যা হযরত ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বলেছেন তাই সত্য, অথবা অপর দুটির যে কোন একটি সত্য, এরূপ ধারণা হতে পারে। এ হিসাবে প্রত্যেকটিই সত্য বলে তাকলীদ করা যেতে পারে। সুতরাং চার ইমামের যে কোনও একজনের তাকলীদ করলেই মুকাল্লিদের ওয়াজিব আদায় হবে।

وَلٰكِنْ يَنْبَغِىْ اَنْ يُقَلِّدُوْا اَحَدًا اِلْتَزَمَهُ وَلَا يَؤُلُ اِلٰى اٰخَرَ

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যার তাকলীদ একবার করা হয়েছে, তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য মাযহাবে যাওয়া জায়েয হবে না।"

দুররুল মুখতারের তা'জিরের অধ্যায়ে লিখিত আছে– مَنِ ارْتَحَلَ اِلٰى مَذْهَبِ الشَّافِعِىْ يُعَزَّرُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ মাযহাব পরিত্যাগ করে শাফিয়ী (বা অন্য কোন মাযহাব) গ্রহণ করে সে শাস্তির যোগ্য।

'সিরাজিয়া' কিতাবে তা'জিরের অধ্যায়ে লিখিত আছে– "আবূ হাফ্স কবীর বুখারীর পুত্র, আবদুল্লাহ তৎপুত্র আবূ হাফ্স শাফিয়ীগণের আধিক্যবশত উক্ত মাযহাব অবলম্বন করেছেন। এতে তার প্রতি শাস্তি ও দেশত্যাগের আদেশ হয়েছিল।"

'কানযুল উম্মাল' হতে মাওঃ আবদুল হক মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ

سَيَكُوْنُ اَقْوَامٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُغَلِّطُوْنَ فُقَهَاءَهُمْ بَعْضَ الْمَسَائِلِ اُولٰئِكَ شِرَارُ اُمَّتِىْ

অর্থাৎ আমার উম্মাতগণের মধ্যে শীঘ্রই কয়েকটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা ফকীহগণের কোন কোন মাসআলা ভুল মনে করবে, তারা আমার মধ্যে জঘন্য।[২৮]

উপরোল্লেখিত কোরআন, হাদীস এবং ইসলামী বিদ্বানগণের উক্তিসমূহের ভিত্তিতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় মাযহাব মান্য করা ও তাকলীদ করা যে বিদআত ও অবৈধ মনে করেন, তা বাতিলযোগ্য প্রমাণিত হল; বরং সাম্প্রতিককালে সকল মুমিন ও মুসলমানকে চার মাযহাবের যে কোন মাযহাবের অনুসারী হতে হবে।

চার মাযহাবের মধ্যে ছোট খাটো ব্যাপারে মত পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য নেই। তাঁরা একে অন্যের মাযহাবকে অনুমোদন দান করেছেন। চার মাযহাবের ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইজতিহাদের শক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তৎকালীন ইসলামী পাণ্ডিত্যে তাঁদের যে কোন জুড়ি ছিল না, তা সকল বিদ্বানগণ স্বীকার করেছেন। এ কারণেই আলিম সমাজ ও মুসলিম জনসাধারণ চার মাযহাবকে স্বীকার করেছেন। তবে একথা সর্বোতভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিমজাহানে দুই তৃতীয়াংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ বা অনুসারী। আজ হতে প্রায় ১২৫০ বছর পূর্ব হতে মুসলিম জগতের প্রসিদ্ধ মহাজ্ঞানী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসির, মুজতাহিদ, এককথায় সর্বশ্রেণীর অগণিত হকপন্থী আলিমগণ ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম খাঁটি হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করে আসছেন। হাশরের ময়দানে ১২০ কাতারের মধ্যে আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ)-এর উম্মত আশি কাতার হবে। তাই হানাফী মাযহাব পন্থীদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, মহানবীর উম্মত যেমন অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ হবে, তেমনি বর্তমান হানাফী মাযহাবপন্থী গোটাবিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ। সুতরাং হানাফী দলই সবচেয়ে বড় মুসলিম দল।

কাফের মুশরিক গোটা বিশাল ভারতে যে সমস্ত কামেল অলীগণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, যাঁদের উছিলাতে আমরাও মুসলমান

নামে পরিচিত ও গৌরবান্বিত, তাঁরা ছিলেন সকলেই হানাফী মাযহাবের অনুগামী। সবিশেষ উল্লেখ্য যে, ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ ও আলিম খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী, খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া, মুজাদ্দেদ আলফেসানী, শাহ্ বায়জীদ বুস্তামী, শাহ্ মাখদুম, শাহ জালাল, বাকী বিল্লাহ, মোল্লা আলী কারী, মোল্লাজিওন, কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, সৈয়দ আহমদ কিরানবী, কারামত আলী জৌনপুরী, এমদাদ উল্লাহ মুজাহিরে মক্কী, রশীদ আহমদ গাংগুহী, আনওয়ার শাহ, কাশমীরী, মাওঃ থানবী, ফুরফুরার পীর আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) প্রমুখ অগণিত বুযর্গানে দ্বীন ও ইসলামী পণ্ডিতগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)-এর মধ্যে ইজতিহাদ করার মত যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর তাকলীদ বা অনুসরণ করেছেন।

পরিতাপের বিষয়, মাযহাব ও তাকলীদ বিরোধীরা সাম্প্রতিক কালে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মাযহাব ও তাকলীদের বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলিমদেরকে মাযহাবের গুরুত্ব এবং ইমাম আ'যম (রহঃ)-এর গুরুত্ব বুঝা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। আল্লাহপাক আমাদেরকে হানাফী মাযহাবের গুরুত্ব অনুভব এবং মাযহাবের রীতিনীতি যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দিন।

তথ্যসূত্র

১। সূরা নাহল, আয়াত নং ৪৩ (আয়াতের অংশ বিশেষ)।

২। সূরা নিসা, আয়াত নং ৫৯।

৩। তাফসীরে কবীর, ৩ খণ্ড, পৃঃ-১৮০।

৪। প্রাগুক্ত।

৫। মিশকাতুল মাসাবিহ, আবূ বকর ও উমর (রাঃ) অনুচ্ছেদ।

৬। প্রাগুক্ত, বাবে জামিউল মানাকিব হাদীস নং ৫৯৩৬।

৭। প্রাগুক্ত, ঐ হাদীস নং ৫৯৮১।

৮। সুন্নাত ও বিদআত, কৃত মাওঃ মুহাঃ আব্দুর রহীম, পৃঃ-১৯।

৯। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ-৪।

১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ-৫।

১১। মুতারজম বুখারী শরীফ (উর্দূ), ১ম খণ্ড, পৃঃ-৬৩৫।

১২। ফতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-৪৩৬ভ

১৩। মুফতী শফী কর্তৃক রচিত 'কাশফ' গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৭৯।

১৪। ফতওয়ায়ে সিদ্দীকিয়া, প্রণেতা, মাওঃ শাহ সূফী নিসারউদ্দীন আহমদ, পৃঃ-২১০।

১৫। তুহফাতুল মুমিনীন, কৃত মাওঃ শাসসুদ্দীন মোহনপুরী, পৃঃ-১১।

১৬। প্রাগুক্ত।

১৭। ফতওয়ায়ে সিদ্দীকিয়া, প্রণেতা, মাওঃ শাহ সূফী নিসারউদ্দীন আহমদ, পৃঃ-২১১।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ-২০৫।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ-২০৭।

২০। মাযহাব ও তাকলীদ, পৃঃ-২৭।

২১। কামিউল মুবতাদেয়ীন, প্রণেতা, মাওঃ রূহুল আমীন বসিরহাটী, পৃঃ-৭৪২-৭৪৩।

২৩। তুহফাতুল মু'মিনীন, কৃত মাওঃ শামসুদ্দীন মোহনপুরী, পৃঃ-১১।

২৪। মাযহাব ও তাকলীদ, পৃঃ-২১।

২৫। কামিউল মুবতাদেয়ীন, প্রণেতা, মাওঃ রূহুল আমীন বসিরহাটী, পৃঃ-১১৮।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ-১১৬-১১৭।

২৭। ফতওয়ায়ে সিদ্দীকিয়া, প্রণেতা, মাওঃ শাহসূফী নিসারউদ্দীন আহমদ, পৃঃ-২০৮।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ-২১৮, ২২১।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে কিছু কথা

ইসলামী শরীআতে যে চারটি মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে, তন্মধ্যে 'হানাফী মাযহাব' সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম। এ মাযহাবের জনক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের রাজত্বকালে তিনি হিজরী ৮০ সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আ'যম তাঁর উপাধি। আবূ হানীফা নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর পিতার নাম ছাবিত। তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত কালে জন্মলাভ করেন এবং তাঁর দরবারে নীত হয়ে দো'আপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।

ইমাম আবূ হানীফা বাল্যকালে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথম তাঁকে উচ্চ শিক্ষাদীক্ষার জন্য উৎসাহ ও পরামর্শ দান করেন কুফার প্রখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দিস ইমাম শা'বী (রহঃ) তিনি তাঁর সময়কার অনন্য শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি জীবনে প্রায় পাঁচশত সাহাবীর সাথে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তন্মধ্যে ৪৮ জন সাহাবীর নিকট হতে তিনি রীতিমত হাদীস শিক্ষা লাভ করেছিলেন। (তাহযীব গ্রন্থ দ্রঃ) ইমাম আবূ হানীফা পরবর্তীকালে তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম শা'বী ইমাম আবূ হানীফার কেবল উস্তাদই ছিলেন না, বরং হাফেয যাহবীর মতে هُوَ اَكْبَرُ شَيْخٍ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ তিনি আবূ হানীফার প্রধান উস্তাদ ছিলেন।- তাযকিরাতুল হুফ্ফায দ্রঃ।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর বিশিষ্ট আলিমদের নিকট হতে কোরআন, হাদীস, ফিকহ ও কালামশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে অপরিসীম জ্ঞান লাভের পর তিনি কোরআন ও হাদীস হতে কানূন আহরণের জন্য বিশেষ গবেষণা করেন। তাঁর উস্তাদমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত ইমাম হাম্মাদ (রহঃ)। তিনি ছিলেন কুফার বিখ্যাত ইমাম ও যুগশ্রেষ্ঠ উস্তাদ। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর প্রিয় খাদেম ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক প্রখ্যাত তাবেয়ীনের সাহচর্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। ঐ সময় কুফায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় ইমাম আবূ হানীফা ভর্তি হয়ে বিশিষ্ট উস্তাদগণের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিশেষ

পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং চতুর্দিকে সুনাম অর্জন করেন। মূলত ইমাম আবূ হানীফা ফিকহ্শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন ইমাম হাম্মাদের নিকট থেকে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে ইল্‌ম ফিক্‌হের যে ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, তিনি ছিলেন তার ধারক ও বাহক। এমন যুগবরেণ্য ব্যক্তিত্বের শিষ্যত্ব লাভ করেন আবূ হানীফা দ্বিধাহীন চিত্তে। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে নিজেই উক্তি করেছেন ঃ

إِنِّيْ لَمَّا أَرَدْتُ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ جَعَلْتُ الْعُلُوْمَ كُلَّهَا نَصْبَ عَيْنِيْ

فَقَرَأْتُ فَنًّا فَنًّا ـ

অর্থাৎ আমি যখন বিদ্যাশিক্ষালাভের ইচ্ছা পোষণ করলাম, তখন সমগ্র শিক্ষা আমার চোখের নিশানা বানালাম এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলাম।

১২০ হিজরীতে উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি স্বীয় শিক্ষকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পাঠদান ও ফতওয়ার কাজে মশগুল হলেন। বিভিন্ন স্থান হতে জ্ঞানের অন্বেষণে শিক্ষার্থীগণ ভিড় করতে থাকে। তাঁর জীবদ্দশায় এমন সহস্রাধিক মাসআলা ছিল যেসব সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ হাদীস ছিল না এবং সাহাবীদের বাণীও ছিল না। এ কারণে তিনি মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে কোরআন, হাদীস এবং তার মূলনীতি, এজমা ও কিয়াসের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। ইসলামী আইনের উসূল ও ফিকহের তিনিই ছিলেন প্রথম প্রবর্তক। সেজন্য ইতিহাসে তিনি ইমামু আহলির রায় إِمَامُ أَهْلِ الرَّاءِ নামে সুপরিচিত ছিলেন।

ইমাম হাম্মাদ (রহঃ)-এর জীবদ্দশায় আবূ হানীফা ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন। কেননা, ইলমে হাদীসের ওপর পূর্ণাংগ জ্ঞান ব্যতীত ইলমে দ্বীন অর্জন করা মোটেই সম্ভব নয়। এ সময় ইমলামী দুনিয়ায় পূর্ণোদ্যমে হাদীসের শিক্ষা দানের কাজ অব্যাহত ছিল। এ সময় কমপক্ষে দশ হাজার সাহাবা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। লোকজন যেখানেই কোন সাহাবীর খোঁজ পেতেন, সেখানেই তাঁরা নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী শুনার জন্য এবং শরীআতের কোন মাসআলার ব্যপারে জিজ্ঞেস করার জন্য চতুর্দিক হতে আগমন করতেন। এভাবেই সাহাবায়ে কেরাম আজমাঈনের

শাগরিদ হিসেবে খ্যাত তাবেয়ীদের অনেকগুলো জামাআত ইসলামী দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত শহরে সাহাবা অথবা তাবেয়ীদের সমাগম অধিক ছিল, সেগুলোর সংখ্যা অন্যূন পঞ্চাশ হবে। হাফেয যাহ্‌বী এই শহর ও স্থানসমূহের নাম এবং এদের বিবরণ উল্লেখ করে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ্ রচনা করেছেন। এর নাম হল اَلْاَمْصَارُ ذَوَاتُ الْاٰثَارِ – 'হাদীসসমৃদ্ধ শহরসমূহ'। তন্মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে উল্লেখযোগ্য 'হাদীসসমৃদ্ধ শহর' হল মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা ও সিরিয়া– এ পাঁচটি শহর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ। এ সব শহর হতে নবীর প্রচারিত জ্ঞান-ঈমান, কোরআন ও শরীআত সম্পর্কিত ইল্‌ম-এর ফল্গুধারা উৎসারিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা উপরোক্ত শহরসমূহে আগমন করে সাহাবা ও তাবেয়ীদের নিকট হতে হাদীস আহরণ করেন। সংক্ষিপ্তকারে নিচে এর বিবরণ প্রদত্ত হল ঃ

০ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা লেখক আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী ইমাম হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী প্রদত্ত উক্তির ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

اِنَّهٗ اَدْرَكَ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ كَانُوْا بِالْكُوْفَةِ بَعْدَ مَوْلِدِهٖ بِهَا سَنَةَ ثَمَانِيْنَ فَهُوَ مِنْ طَبْقَةِ التَّابِعِيْنَ وَلَمْ يَثْبُتْ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ مِّنْ اَئِمَّةِ الْاَمْصَارِ الْمُعَاصِرِيْنَ لَهٗ كَالْاَوْزَعِىْ بِالشَّامِ وَالْحَمَّادِ بْنِ بِالْبَصْرَةِ وَالثَّوْرِىْ بِالْكُوْفَةِ وَمَالِكٌ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِمِصْرَ -

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) সাহাবাদের এক জামাআতকে দেখতে পেয়েছেন, যারা কুফা নগরে থাকতেন, যখন তিনি ৮০ হিজরী সনে তথায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর সহযোগী সিরিয়ার আওযায়ী, বসরার হাম্মাদ ইবনে সালমা ও হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, কুফার সুফইয়ান সওরী, মদীনার মালেক (আনাস বিন মালেক) এবং মিশরের লাইছ ইবনে সা'আদ প্রমুখ ইমাম এই মর্যাদা লাভ করেন নাই।[১]

০ ইবনে হাজার মক্কী মিশকাতের ব্যাখ্যায় আরও লিখেছেন ঃ

اَدْرَكَ الْاِمَامُ الْاَعْظَمُ ثَمَانِيَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ اَنَسٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَاَبُوا لطُّفَيْلِ -

অর্থ ঃ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা আটজন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। তন্মধ্যে আনাস বিন মালেক, আবদুল্লাহ বিন আওফা, সহল ইবনে সা'আদ এবং আবূ তোফাইল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

০ আল্লামা আলাউদ্দীন 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ وَاَدْرَكَ بِالسِّنِّ نَحْوَ عِشْرِيْنَ صَحَابِيًّا বয়সের হিসেবে তিনি (আবূ হানীফা) প্রায় বিশজন সাহাবীকে পেয়েছেন।[৩]

০ তিনি 'মুনিয়াতুল মুফতী' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও লিখেছেন ঃ وَصَحَّ اَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ سَبْعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ ইমাম আবূ হানীফা সাতজন সাহাবীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন, এটা যথার্থ।[৪]

০ আল্লামা ইবনে আবেদীন রদ্দুল মুহতারে লিখেছেন ঃ

وَعَلٰى كُلٍّ فَهُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِذَاكَ الْحَافِظُ الذَّهَبِىُّ وَالْحَافِظُ الْاَسْقَلَانِىُّ

সব দিকেরই বিচারে ইমাম আবূ হানীফা তাবেয়ী ছিলেন। হাফেয যাহবী ও হাফেয আসক্বালানী তা দৃঢ়তাসহকারেই ঘোষণা করেছেন।[৫]

সাম্প্রতিক কালের ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন ঃ

اِنَّهٗ تَابِعِىٌّ رُؤْيَةً وَّتَبْعُ التَّابِعِيْنَ رِوَايَةً

তিনি সাক্ষাত লাভের দিক দিয়ে তাবেয়ী ছিলেন এবং তাবে-তাবেয়ীন ছিলেন হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে। –বুখারীর শরাহ ফয়যুল বারী দ্রঃ।[৬]

সুতরাং উপরোক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ) তাবেয়ী ছিলেন। তিনি যে সকল তাবেয়ীদের নিকট হতে জ্ঞানার্জন ও হাদীস শ্রবণ করেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য ঃ

০ **ইমাম শা'বী (রহঃ) ঃ** ইমাম শা'বী সর্বপ্রথম ইমাম আবূ হানীফাকে উচ্চ শিক্ষা হাসিলের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ। কথিত আছে, ইমাম শা'বী প্রায় পাঁচশত সাহাবাকে দেখেছিলেন। তিনি ছিলেন তদানীন্তন কুফার ইমাম ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) একবার তাঁকে হাদীসের মাগাযী (যুদ্ধসংক্রান্ত) অধ্যায়ে পড়তে দেখে বলেন– আল্লাহর শপথ! এই ব্যক্তি উক্ত বিষয়টি আমার চেয়ে ভাল জানেন।' তিনি দীর্ঘদিন বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। খলীফা ও সুলতানগণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ইলমে হাদীসের এই বরেণ্য আলেম ১০৪ অথবা ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৭]

০ **হযরত সালাম ইবনে কুহাইল ঃ** প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাবেয়ী ছিলেন। তিনি কুফার অধিবাসী। তিনি কয়েকজন সাহাবা হতে হাদীস্ রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে সা'আদ তাঁকে কাসীরুল হাদীস বলেছেন।[৮]

০ **হযরত মাহারিস ইবনে বিসার ঃ** তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এবং হযরত জাবির (রাঃ)সহ অন্যান্য সাহাবাদের থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি কুফার কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১১৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৯]

০ **হযরত সুলাইমান ইবনে মিহরান ঃ** তিনি কুফার একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ইমাম ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফ (রাঃ) থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম সুফইয়ান সাওরী ও ইমাম শা'বী তাঁর ছাত্র ছিলেন।[১০]

০ **হযরত হিশাম ইবনে উরওয়াহ ঃ** তিনি একজন মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। অনেক সাহাবা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুফইয়ান সওরী, সুফইয়ান ইবনে উআইনাসহ প্রখ্যাত ইমামদের ছাত্র ছিলেন। সে যুগে তিনি ইমামুল হাদীস হিসেবে খ্যাত ছিলেন।[১১]

০ **হযরত কাতাদা ঃ** প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও খ্যাতনামা তাবেয়ী ছিলেন। তিনি হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারাখ্স (রাঃ) এবং হযরত আবূ তোফায়েল (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম কাতাদা হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর নামযাদা ছাত্র ছিলেন।[১২]

০ হযরত সাম্মাক ইবনে হারব ঃ তিনি উঁচুমানের মুহাদ্দিস ছিলেন এবং হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার বিশেষ উস্তাদ ছিলেন। তিনি ৮০ জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন।[১৩]

০ হযরত আবূ ইসহাক সাবঈ ঃ প্রথম সারির তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে জুবাইর (রাঃ), হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ), হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। কথিত আছে, ৩৮ জন সাহাবী থেকে তিনি সরাসরি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।[১৪]

০ হযরত শু'বা ঃ তিনি হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে ও হযরত আমর বিন মুসলিম (রাঃ) এই দু'জন সাহাবীকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী এক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রায় সকল বড় বড় হাদীসবিদের নিকট হতেই তিনি হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর হাদীসের উস্তাদদের মধ্যে প্রায় চারশত তাবেয়ী রয়েছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন যে, কুফা নগরের তিনশত হাদীসবিদের নিকট হতে তিনি হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেছেন। ইমাম আ'যমের সংগে তাঁর গভীর সম্প্রীতি ছিল। হযরত শু'বা (রঃ) ১৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[১৫]

০ হযরত আতা ইবনে আবি রিবাহ ঃ তিনি খ্যাতনামা তাবেয়ী ছিলেন। তিনি অনেক সাহাবার খেদমত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব, হযরত আকীল, হযরত রাফে, হযরত আবুদ্দারদা, হযরত ইবনে জুবাইর, হযরত উসামা ইবনে জায়েদ, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত ইবনে উমর, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম এবং হযরত আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহুমসহ অনেক সাহাবা হতে হাদীস রেওয়াতে করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইবনে সাআদ বলেন– كَانَ ثِقَةً فَقِيْهًا كَثِيْرَ الْحَدِيْثِ তিনি ফিকহ-জ্ঞানসম্পন্ন ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। আতা ইবনে আবি রিবাহ মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১১৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। যখনই ইমাম আবূ হানীফা মক্কা শরীফে গমন করতেন তখনই তাঁর খিদমতে হাজির হতেন এবং তা'লীম হাসিল করতেন।[১৬]

ইমাম আবূ হানীফা মক্কা শরীফে গমন করে হযরত ইবনে আবি রিবাহ ছাড়াও হযরত ইকরিমার খেদমতে যেয়ে হাদীস শ্রবণ করতেন। হযরত ইকরিমা

হযরত ইবনে আব্বাসের গোলাম ও শাগরিদ ছিলেন। তাছাড়া অনেক সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রায় ৭০ জন প্রখ্যাত তাবেয়ী হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমাম শা'বী বলতেন, বর্তমানে হযরত ইকরিমা সবচেয়ে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী মানুষ।[১৭]

০ **হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার ঃ** তিনি মদীনাবাসী উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর গোলাম ছিলেন। এ কারণেই তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীদের নিকট হতে হাদীস আহরণ করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছিলেন।[১৮]

০ **হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ঃ** মদীনাবাসী ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-এর পৌত্র ছিলেন। তিনি পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবূ হুরায়রা, আবূ আইউব আনসারী, আয়েশা-এর নিকট হতে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম আ'যম তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে হাদীস শ্রবণ করেন।[১৯]

০ **ইমাম আওযাঈ ও ইমাম মকহুল ঃ** তাঁরা সিরিয়ায় 'ইমামে মাযহাব' হিসেবে আখ্যায়িত ছিলেন। ইমাম আ'যম তাঁদের দরবারে হাদীসের 'সনদ' হাসিল করেন। এই সময় ইমাম আবূ হানীফার বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা ও ইজতিহাদের প্রচার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁকে কিয়াস-এর অধিকারী হিসেবে প্রচার করেন।[২০]

০ **হযরত ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদিক ঃ** তাঁরা ছিলেন মদীনাবাসী। ইমাম বাকেরের পুত্র ইমাম জাফর সাদিক। তাঁদের উভয়ের নিকট থেকে ইমাম আবূ হানীফা ইল্‌ম হাসিল করেন।[২১]

উপরোক্ত জগদ্বিখ্যাত তাবেয়ীগণ ছিলেন ইমাম আ'যমের উস্তাদ। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, ইল্‌মে হাদীসে ইমাম আ'যম (রহঃ) একটি উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন। কেননা, তাঁর উস্তাদ ছিলেন অসংখ্য। আবূ হাফ্‌স উমর বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা কমপক্ষে চার হাজার ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।। আল্লামা যাহাবী-এর 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' গ্রন্থে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। হাফেয মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী শাফিয়ী বলেন ঃ

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنْ كِبَارِ حُفَّاظِ الْحَدِيْثِ وَاَعْيَانِهِمْ وَلَوْ لَا

كَثْرَةُ اِعْتِنَائِهِ بِالْحَدِيْثِ مَا تَهَيَّأَ لَهُ اِسْتِنْبَاطُ مَسَائِلِ الْفِقْهِ

ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের বড় বড় হাফেয ও গুরুদের মধ্যে গণ্য। তিনি যদি হাদীসের প্রতি খুব বেশী মনোযোগী না হতেন ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন না হতেন, তাহলে ফিক্‌হের মাসায়েল বের করা তার পক্ষে কখনই সম্ভব হত না।– তাবাকাতুল হুফ্‌ফায দ্রঃ।[২২]

শায়খুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা অত্যন্ত মুত্তাকী, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন সাধক, আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িক কালের সকলের অপেক্ষা হাদীসের বড় হাফেয ছিলেন।"– মানাকিবে আবূ হানীফা দ্রঃ।[২৩]

০ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সায়ীদুল কাতান বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ وَاللّٰهِ لَاَعْلَمُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِمَا جَاءَ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رُسُلِهٖ

আল্লাহর শপথ, আবূ হানীফা বর্তমান মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস ও সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।[২৪]

০ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীনকে যখনই ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হত, তখনই তিনি বলতেন ঃ ثِقَةٌ مَامُوْنٌ مَا سَمِعْتُ اَحَدٌ اَضْعَفَهٗ তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত। হাদীসের ব্যাপারে কেউ তাঁকে দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন বলে আমি শুনি নাই।– উম্‌দাতুল ক্বারী দ্রঃ।[২৫]

০ বলখের ইমাম ইবনে আইউব সত্যই বলেছেন ঃ

صَارَ الْعِلْمُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلٰى مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَارَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ ثُمَّ صَارَ اِلَى التَّابِعِيْنَ ثُمَّ صَارَ اِلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ ـ

প্রকৃত ইল্‌ম আল্লাহর নিকট হতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছেছে। তারপর তাঁর সাহাবীগণ তা লাভ করেছেন। সাহাবীদের নিকট হতে পেয়েছেন তাবেয়ীগণ। আর তাবেয়ীগণের নিকট হতে তা কেন্দ্রীভূত ও পরিণত হয়েছে ইমাম আবূ হানীফাতে।[২৬]

এ সমস্ত উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আ'যম বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বান ছিলেন। আর এই সকল হাদীস-এর দ্বারা তিনি কিয়াস ও বুদ্ধি প্রয়োগের সাহায্যেই মাসআলার রায় দিতেন। মাসআলার রায় দেয়ার ব্যাপারে তাঁর নীতি কী ছিল, তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি হতেই সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণিত হয়। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنِّىْ اٰخُذُ بِكِتَابِ اللّٰهِ اِذَا وَجَدْتُهٗ فَمَالَمْ اَجِدْهُ فِيْهِ اَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاٰثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِىْ فَشَتْ فِىْ اَيْدِى الثِّقَاتِ فَاِذَا لَمْ اَجِدْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذْتُ بِقَوْلِ اَصْحَابِهٖ مَنْ شِئْتُ وَاَدَعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ ـ

অর্থাৎ আমি প্রথমে আল্লাহর কিতাবকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, যখন তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফায়সালা পাই, তখন সে অনুযায়ীই রায় দেই। তাতে যদি না পাই, তবে অতঃপর রাসূলের সুন্নাত ও বিশুদ্ধ কার্য বিবরণী– যা নির্ভরযোগ্য লোকদের মারফতে প্রচারিত হয়েছে– গ্রহণ করি। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতেও যদি তা না পাই, তবে তখন আমার নীতি এই হয় যে, সাহাবীদের মধ্য হতে কারো কথা গ্রহণ করি আর কারো কথা ছেড়ে দেই।– তারীখে ত্‌তাশ্‌রী' দ্রঃ।[২৭]

ইমাম আবূ হানীফা যে সকল হাদীস তাবেয়ীদের নিকট হতে শ্রবণ করেছিলেন, তন্মধ্য হতে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর আদেশ-নিষেধমূলক হাদীসসমূহের একটি সংকলন প্রণয়ন করেন। এই সংকলনের নাম হচ্ছে, 'কিতাবুল আ-ছার'। দুনিয়ার মুসলিম জাতির নিকট এর চেয়ে প্রাচীনতম হাদীস গ্রন্থ সম্ভবত আর একখানিও বর্তমান নেই। ইমাম আবূ হানীফা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সময় প্রতিষ্ঠিত কুফার জামে মসজিদের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হয়ে একদিকে যেমন 'ইল্‌মে ফিকহে'র ভিত্তি স্থাপন করেন, অপরদিকে সেই সংগেই তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আদেশে-নিষেধমূলক হাদীসসমূহের এই সংকলন রচনা করেন।

ইমাম আ'যমের সংকলিত 'কিতাবুল আসার' সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী লিখেছেন ঃ

وَالْمَوْجُوْدُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ مُفْرَدًا اِنَّمَا هُوَ كِتَابُ الْاٰثَارِ اَلَّتِىْ رَوَاهَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ عَنْهُ ـ

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বর্ণিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ বর্তমান। আর তা হচ্ছে– 'কিতাবুল আছার'– তা তাঁর নিকট হতে (ইমাম) মুহাম্মদ ইবনে হাসান বর্ণনা করেছেন।[২৮]

'কিতাবুল আছার' নামক হাদীস গ্রন্থখানি প্রণয়নের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ ও ছাঁটাই-বাছাই করেছেন। সদরুল আয়িম্মা মুয়াফ্‌ফিক ইবনে আহমদ মক্কী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) চল্লিশ হাজার হাদীস হতে ছাঁটাই-বাছাই করে 'কিতাবুল আছার' প্রণয়ন করেন।– মানাকিবে ইমাম আ'যম দ্রঃ।

হাদীস চয়ন ও হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর এই অসামান্য সতর্কতার কথা সকল হাদীস-পারদর্শী স্বীকার করেছেন। ইমাম ওকী (রঃ) বলেছেন ঃ

لَقَدْ وُجِدَ الْوَرَعُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْحَدِيْثِ مَالَمْ يُوْجَدْ عَنْ غَيْرِهٖ ـ

অর্থাৎ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা কর্তৃক যেরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছে, তদ্রূপ আর কারও দ্বারা অবলম্বিত হয় নাই।[২৯]

ঠিক এ কারণেই মনে হয়, মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁকে مُشَدِّدٌ فِى الرِّوَايَةِ হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত কঠোর ও কড়া লোক বলে অভিহিত করেছেন এবং এ জন্যই তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুব বেশী হতে পারে নাই। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

وَالْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اِنَّمَا قَلَّتْ رِوَايَتُهٗ لِمَا شَدَّ فِىْ شُرُوْطِ الرِّوَايَةِ وَالتَّحَمُّلِ

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণ এই যে, তিনি হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ব্যাপারে কঠোর নৈতিক শর্ত আরোপ করেছেন।– মুকাদ্দামাতু ইবনু খালদুন দ্রঃ।[৩০]

'মানাকিবে ইমাম আ'যম' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার সংগৃহীত হাদীসের বিপুলতার সামান্য পরিমাণ বর্ণনা করা সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

عِنْدِىْ صَنَادِيْقُ مِنَ الْحَدِيْثِ مَا اَخْرَجْتُ مِنْهَا اِلاَّ الْيَسِيْرَ الَّذِىْ يُنْتَفَعُ بِهٖ

আমার নিকট কয়েক সিন্দুক ভর্তি লিখিত হাদীস সম্পদ মওজুদ রয়েছে। কিন্তু আমি তা হতে অতি অল্প সংখ্যকই প্রকাশ ও বর্ণনা করেছি, যা লোকদের ব্যবহারিক জীবনের উপকার দিবে।[৩১]

ইমাম আ'যমের অসংখ্য শাগরিদ ছিল। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

হাদায়েকে হানাফিয়া কিতাবে আছে–

অন্যতম শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আলী মাদানী বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফার নিকট হতে সওরী, ইবনে মুবারক, মহাম্মাদ বিন যায়েদ হিশাম, ওকী, ইবনে আওয়ামএবং জাফর প্রমুখ ব্যক্তিগণ রেওয়ায়েত করেছেন। মাগ্‌নী কিতাবে আছে, ইমাম আবূ হানীফার নিকট হতে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ওকী, ইয়াযীদ বিন হারূন, আলী বিন আসেম, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন হাসান ও শায়বানী প্রমুখ রেওয়ায়েত করেছেন। উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ আছে যে, কোন কোন মুহাদ্দিস ইমাম আ'যমের গুণাবলীতে তাঁর আটশত শাগরিদের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আ'যম (রঃ)-এর সংগৃহীত হাদীস 'কিতাবুল আছার' ছাড়া আরও সুবৃহৎ পনেরখানা 'মসনদ' রয়েছে। যাতে মুহাদ্দিস ও ইমামগণ ইমাম সাহেবের রেওয়ায়েতসমূহ একত্রিত করেছেন। তিনি যে সকল হাদীসের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেন, 'মুসনাদু আবী হানীফা' সেই সকল হাদীসের সংকলন। এদের পনেরখানা 'মুসনাদ'-এর মধ্যে দশ খানা অদ্যবধি বর্তমান আছে।[৩২]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর জীবনের সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব ও প্রসিদ্ধ কাজ হল ইসলামী ফিক্‌হে'র সম্পাদনা করা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি

সুশৃংখলভাবে ইসলামী ফিক্‌হের সম্পাদনা করেছেন। মূলত তিনি ছিলেন ফিক্‌হ শাস্ত্রের উস্তাদ ও ইমাম। এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর বর্ণিত প্রতিটি মাসআলাই পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। ইমাম আ'যম বহু সহস্র হাদীস (কারো মতে বিশ হাজার) এর স্পষ্টাংশ ও অস্পষ্টাংশ হতে ৮৩ হাজার মাসায়েল প্রকাশ করেছেন। 'এলাউস্ সুনান' গ্রন্থে উক্ত হাদীসগুলি সংকলন করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি সম্প্রতি ২১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, 'জয়লে-জাওয়াহেরে মজিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, ইমাম আ'যম ৭০ হাজারেরও অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো ৭শত মতান্তরে ৮শত শিষ্য রেওয়ায়েত করেছেন। তা 'জয়লে জাওয়াহেরে মজিয়া' শামী– ১ম খণ্ড ও 'খায়রাতুল হিসান' কিতাবসমূহে লিখিত আছে।[৩৩]

০ তাফসীরে কবীরে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْفُقَهَاءَ زَعَمُوا اَنَّ اُصُوْلَ الشَّرِيْعَةِ اَرْبَعٌ اَلْكِتَابُ اَلسُّنَّةُ وَالْاِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ -

ফিক্‌হের শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন যে, শরীআতের মৌলিক নীতি চারটি ঃ কোরআন, সুন্নাহ, এজমা ও কিয়াস।[৩৪]

শরীআতের প্রধান উৎস এবং মূলনীতি হলো পবিত্র কোরআন। দ্বিতীয় উৎস হল সুন্নাহ বা হাদীস। নবী করীম (সাঃ) যা বলেছেন, করতে বলেছেন এবং তিনি যে কাজের প্রতি সম্মতি প্রদান করেছেন ইত্যাদির সমষ্টিকে হাদীস ও সুন্নাহ বলা হয়। ইসলামী শরীআতের তৃতীয় উৎস হলো এজমা। নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর শরীআতের এরূপ মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা ছিল সংক্ষিপ্ত অথবা নবী করীম (সাঃ)-এর একই আমলের ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তখন ঐ সমস্ত বিভিন্ন রেওয়াতের মধ্যে পরামর্শ করে সাহাবায়ে কেরাম একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। তাকেই 'এজমা' বলা হয়। শরীআতের চতুর্থ উৎস হল 'কিয়াস'। কোন বিষয় সম্পর্কে শরীআতের যে নির্দেশ রয়েছে, ঐ নির্দেশ একই পর্যায়ের কারণে অন্য একটি বিষয় সম্পর্কে নির্ধারণ করাকে কিয়াস বলে। কিয়াস একটি অত্যাবশ্যকীয় কানূন। এর অসংখ্য প্রমাণ কোরআন, সুন্নাহ ও এজমায়ে বিদ্যমান। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

কিয়াস হল আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তখন মূল আইন বা বিধান হতে ইল্লাত বা কারণের মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়, এর ফলে আইনের যে বিস্তৃতি ঘটে তাই কিয়াস। ইমাম আবূ হানীফা প্রথম মাসআলা নিরূপণের ক্ষেত্রে কিয়াস বা সাদৃশ্য মূলক যুক্তিগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর যুগের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন মাসআলা সংকলিত ও সম্পাদিত হলেও পৃথক বিষয় হিসেবে সুবিন্যস্ত ছিল না। মাসআলা নির্গত করার এবং দলীল গ্রহণের নিয়ম-কানূনের প্রবর্তন তখনও হয়নি। আহকামের খণ্ড মাসআলা নির্গত করার নীতি হাদীসে বিভিন্নভাবে বিদ্যমান ছিল। ইমাম আ'যম ১২০ হিজরীতে কতগুলো নিয়ম, কায়দা-কানূন ও মূলনীতির অধীনে ফিক্‌হের খণ্ড মাসআলাসমূহ সম্পাদনা ও বিন্যস্ত করার কাজ শুরু করেন। এ জন্যেই তাঁকে ফিক্‌হে ইসলামীর 'আবিষ্কারক'-এর উপাধি দেয়া হয়।

ইমাম আবূ হানীফার ফিক্‌হ সম্পাদনার পদ্ধতি ছিল এই যে, প্রতিটি মাসআলা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কী বিধান রয়েছে, তা তিনি প্রথমে খোঁজ করে বের করতেন। যদি পবিত্র কোরআনে পেতেন তবে তা লিপিবদ্ধ করতেন। যদি না পেতেন, তাহলে নবী করীম (সাঃ)-এর সর্বশেষ আমল ও মতামত কী ছিল, তা দেখে তিনি সর্বশেষ আমল ও মতামত গ্রহণ করতেন। যদি হিজাযী ও ইরাকী সাহাবাদের 'মারফূ' হাদীসসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য হত, তাহলে ফিক্‌হ সম্পর্কে অভিজ্ঞ বর্ণনাকারীর রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। যদি হাদীসের দ্বারা কোন সমাধান না পাওয়া যেত, তখন ফতওয়া প্রদানকারী সাহাবা ও তাবেয়ী ও ফকীহদের ফায়সালা এবং বাণী খোঁজ করতেন এবং যে বিষয়ে ফকীহ সাহাবাদের এজমাতে একমত পাওয়া যেত, তা গ্রহণ করতেন। যদি এর মধ্যে কোন সমাধান না পেতেন, তাহলে ৪র্থ বারে কিয়াস করতেন। কোন কোন মাসআলা সম্পর্কে গবেষণা বা কিয়াস করার সময় লক্ষ্য রাখতেন যে, মাস্‌আলা যেন শরীআতের খেলাফ না হয়।

ইমাম আবূ হানীফা মাসআলাসমূহের বিন্যস্ত ও নীতিমালাসমূহের সম্পাদনা শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তাঁর বিশিষ্ট চল্লিশজন ফকীহ্ শিষ্যদেরকে নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করেন। তাঁরা দীর্ঘ ত্রিশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে হানাফী আইন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ সকল শিষ্যের মধ্যে আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, ইয়াহ্ইয়া, হাফ্‌স বিন গিয়াস, দাউদ তাঈ, আসাদ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন মুবারক, যোফার প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। সুদীর্ঘ বাইশ (২২) বছর

ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পাদনা পরিষদের একনিষ্ঠ পরিশ্রমে 'কুতুবি আবী হানীফা' শীর্ষক গ্রন্থখানি পূর্ণতা লাভ করেছিল। এতে সর্বমোট ৮৩ হাজার মাস্‌আলা ছিল। তন্মধ্যে ৩৮ হাজার ইবাদত সম্পর্কীয় এবং ৪৫ হাজার মাসায়েল্ সামাজিক ও দণ্ডবিধি সম্পর্কীয় ছিল।

ইমাম আবূ হানীফার ফিক্‌হ সম্পাদনা পরিষদ সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ওকী বলেন ঃ "ইমাম আ'যমের এ মহৎ কাজে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম যোফার ও ইমাম মুহাম্মদের কিয়াস ও ইজতিহাদের বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও এতে কিভাবে ত্রুটি থাকতে পারে? ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে যাকারিয়া, ইবন গিয়াস ছা'বান প্রমুখের মত হাদীসবিশারদ; কাসিম ইবনে মুঈনের মত আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ; দাউদ তাঈ এবং ফুযাইল ইবনে আয়াযের মত তাকওয়াধারী ব্যক্তিবর্গ পরিষদের সদস্য থাকা সত্ত্বেও এ কাজে কিভাবে ত্রুটি থাকতে পারে।"– জামিউল মাসানিদের টীকা দ্রঃ।[৩৫]

ফিক্‌হ-শাস্ত্র সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর সমস্ত ছাত্রকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কুফার জামে মসজিদে এক হাজার বিজ্ঞ আলিম একত্রিত হলেন। তাদের মধ্যে ফিক্‌হ সম্পাদনা পরিষদের চল্লিশজন সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আ'যম সকলের উদ্দেশে বললেন ঃ "তোমরাই আমার অন্তরের একমাত্র খুশীর মূল। তোমাদের উপস্থিতি আমার অন্তরের সমস্ত চিন্তা দূরীভূত করে থাকে। আমি তোমাদের জন্য ইসলামী ফিক্‌হের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি, তোমরা ইচ্ছানুযায়ী এর উপর বিচরণ করতে পার। আমি এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছি যে, লোকজন তোমাদের অনুসরণ করবে। আমি তোমাদের জন্য আমার গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছি। আমি আল্লাহর কসম এবং ঐ জ্ঞানের অংগীকার দিচ্ছি যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে– তোমরা কখনো এই ইলম (জ্ঞান)কে অসম্মান করো না। এ ইলমকে বিকৃত করার হাত হতে রক্ষা করো।" মুসান্নিফীন, ২য় খণ্ড দ্রঃ।[৩৬]

ইমাম আবূ হানীফার বক্তৃতার ফলে সমবেত ফিক্‌হবিদদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। তাঁর সম্পাদিত এই ফিকহ 'ফিক্‌হে হানাফী' নামে সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় খ্যাতি লাভ করে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রে মুসলিমজাহানে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং সুনাম অর্জন করেছিলেন, ঠিক তেমনি ইসলামী 'আকাইদ'-এর উপরও তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিশেষত মাতুরীদী মাযহাব এবং এই মাযহাবের প্রসিদ্ধ প্রবক্তাগণ সামারকান্দে ইমাম আবূ হানীফার

'আকাইদ' বা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব বহন করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা কৃত মাত্র একখানা প্রামাণিক দলীল অর্থাৎ উসমান আল্-বাত্তীকে লিখিত তাঁর একখানা পত্র রয়েছে। যাতে তিনি মার্জিতভাবে তাঁর মতের সমর্থন করেন। ইবনে নাদ্বীম-এর তালিকা পরবর্তী জনশ্রুতি অনুযায়ী ফিক্হে আকবর (২য়) নামক যে গ্রন্থটি ইমাম আ'যম কর্তৃক রচিত হয়, তাতে 'কালাম' শাস্ত্রের উৎপত্তির প্রারম্ভিক অবস্থায় ইসলামী আকাইদের রূপরেখা যেমন ছিল তেমনই বিধৃত হয়েছে। এটা সম্ভবত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত। আরও একখানা স্বতন্ত্র 'ফিকহে আকবর' (১ম) একখানা ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত (মূল ও ভাষা ১৩২১ সনে হায়দারাবাদে মুদ্রিত) অবস্থায় রয়েছে। বিশুদ্ধ মূলগ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। এ গ্রন্থে খারিজী, কাদিরিয়া, শিয়া ও জাহামীদের আকাঈদের বিপরীত সুন্নী মতানুযায়ী ঈমানের দশটি দফা সন্নিবেশিত হয়েছে। সে দশ দফার আরও বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজনে "ওয়াসিয়াতু আবী হানীফা" নামক একখানা স্বতন্ত্র পুস্তকে তা সম্পন্ন করা হয়। "আল-আলিমু ওয়াল মুতাআল্লিমু' নামক প্রশ্নোত্তর সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তকও তিনি রচনা করেন।– সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ দ্রঃ।[৩৭]

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের যুলুম ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে ইমাম আ'যম ছিলেন সোচ্চার। শাসকেরা তাঁর ভয়ে ভীত ছিল। আব্বাসীয় খলীফা মনসূর তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারেও তাকে উৎপীড়ন করা হয়।পরিশেষে তাঁকে খাদ্যের সাথে বিষ পান করানো হয়। তিনি বিষের ক্রিয়া অনুভব করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সেজদায় রত হন। ঐ অবস্থায় তাঁর প্রাণ বায়ু নির্গত হয়। ১৫০ হিজরীতে রজব মাসে ইমামে আ'যমের জীবনাবসান ঘটে। বাগদাদে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুসলিম দুনিয়ার খ্যাতনামা আলিম ও বুযর্গানে দ্বীন ইমাম আ'যম সম্পর্কে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের উক্তি নিচে বিবৃত হল ঃ

০ 'সীরাতে আয়িম্মায়ে আরবা'আ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে ঃ

فن حدیث میں امام ابوحنیفہ کا کبار محدثین میں ہونا امرسے ثابت ہے کے انکا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیاجاتاہے ۔

অর্থাৎ হাদীস বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফাকে বড় বড় মুহাদ্দিসগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। এর প্রমাণ এই যে, মুহাদ্দিসগণ তাঁর মাযহাবকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন।[৩৮]

শায়খুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন বলেন ঃ

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ تَقِيًّا نَقِيًّا زَاهِدًا عَابِدًا عَالِمًا صَدُوْقُ اللِّسَانِ اَحْفَظَ اَهْلِ زَمَانِهِ -

ইমাম আবূ হানীফা অত্যন্ত মুত্তাকী, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন সাধক, আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িককালের অপেক্ষা হাদীসের বড় হাফেয ছিলেন।[৩৯]

০ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদুল কাতান বলেন ঃ

اِنَّهٗ وَاللّٰهِ لَاَعْلَمُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِمَا جَاءَ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُلِهٖ -

আল্লাহর শপথ, (ইমাম আবূ হানীফা) তিনি বর্তমান মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে বেশী জ্ঞানী।[৪০]

০আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেছেন ঃ দুনিয়ার সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও মুজতাহিদগণ ইমাম আ'যমকে শ্রেষ্ঠতম থেকে শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ও আলিম হিসেবে বহু প্রশংসা করেছেন।[৪১]

০ ইমাম আবূ দাউদ বলেন ঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা অবশ্যই 'ইমাম আ'যম' উপাধির যোগ্য ছিলেন।[৪২]

০ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন ঃ ইমাম আ'যম একজন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ফকীহ মুজতাহিদ ছিলেন।[৪৩]

০ ইমাম শাফিয়ী বলেন ঃ অন্যান্য ফকীহ্ আলিমগণ প্রত্যেকেই ইমাম আবূ হানীফার শিষ্যসদৃশ।[৪৪]

০ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ লোকেরা ফিক্‌হশাস্ত্রে নিদ্রিত ছিল। ইমাম আ'যম সে বিষয়ে সকলকে জাগ্রত করেছেন।[৪৫]

০ ইমাম তাহতাবী বলেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা চারশত তাবিয়ী শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, আর চারহাজার লোক তার নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা করেছিলেন।[৪৬]

পরিতাপের বিষয়, এমন কীর্তিমান মহাপুরুষ ইমাম আ'যম সম্পর্কে মাযহাব বিরোধীরা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কটুক্তি করে থাকেন। তারা হানাফী মাযহাব ও তাকলীদের বিরুদ্ধাচারণ করে চলেছে। তাই, ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও মাযহাব বিরোধীদের নিকট ইমাম আ'যমের কর্মময় জীবনের কিছু কথা তুলে ধরা হল।

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে ইমাম আ'যম (রহঃ)-এর আদর্শে, পথে ও মতে চলার তৌফিক দান করুন এবং পরকালে তাঁরই শামিয়ানা তলে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'-এর সাথে থাকার সুযোগ দান করুন। আমীন। —বি-হুরমাতে সাইয়িদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম।

তথ্যসূত্র

১। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, — মাওঃ আবদুর রহীম, পৃঃ—২৬৩।
২। প্রাগুক্ত
৩। প্রাগুক্ত।
৪। প্রাগুক্ত।
৫। প্রাগুক্ত।
৬। প্রাগুক্ত
৭। বংগানুবাদ মুসনাদে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা-এর ভূমিকায় লিখিত ইমাম আবূ হানীফার জীবনী অধ্যায়।
৮। প্রাগুক্ত।
৯। প্রাগুক্ত।
১০। প্রাগুক্ত।
১১। প্রাগুক্ত।
১২। প্রাগুক্ত।
১৩। প্রাগুক্ত।
১৪। প্রাগুক্ত।
১৫। প্রাগুক্ত এবং হাদীস সংকলনের ইতিহাস, — মাওঃ আবদুর রহীম, পৃঃ—২৭৯।
১৬। প্রাগুক্ত এবং হাদীস সংকলনের ইতিহাস, — মাওলানা আবদুর রহীম, পৃঃ—২৪১।
১৭। প্রাগুক্ত।
১৮। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, — মাওঃ আবদুর রহীম, পৃঃ—২৪০।
১৯। প্রাগুক্ত।

২০। প্রাগুক্ত।
২১। প্রাগুক্ত।
২২। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, – মাওঃ আবদুর রহীম, পৃঃ–২৬৬।
২৩। প্রাগুক্ত।
২৪। প্রাগুক্ত।
২৫। প্রাগুক্ত।
২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ–২৬৭।
২৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ–২৬৯।
২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ–৩১১।
২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ–৩১২।
৩০। প্রাগুক্ত, পৃঃ–৩১২।
৩১। প্রাগুক্ত, পৃঃ–৩১২।
৩২। ফতওয়ায়ে সিদ্দীকিয়া, প্রণেতা, মাওঃ শাহসূফী নিসার উদ্দীন আহমদ, পৃঃ–২৮১-২৮২ এবং সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ–৫৬।
৩৩। মাযহাব ও তাকলীদ, পৃঃ–৪১।
৩৪। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই, ফা, বা, পৃঃ–২২।
৩৫। বংগানুবাদ মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা (ভূমিকা), পৃঃ–৯।
৩৬। প্রাগুক্ত।
৩৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ–৫৬।
৩৮। আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন, ই,ফা,বা, পৃঃ–১০২।
৩৯। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, – মাওঃ আবদুর রহীম, পৃঃ–২৬৬ভ
৪০। প্রাগুক্ত।
৪১। তুহফাতুল মু'মিনীন, –মাওঃ শামসুদ্দীন মোহনপুরী, পৃঃ–৩৪।
৪২। প্রাগুক্ত।
৪৩। প্রাগুক্ত।
৪৪। প্রাগুক্ত।
৪৫। প্রাগুক্ত।
৪৬। প্রাগুক্ত।

আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ

তাসলীম বাদ আরয– দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, সারা দুনিয়ার বিধর্মীরা আজ ঐক্যবদ্ধ। তারা নিজেদেরকে একটি সমান্তরাল রেখায় ঐক্যবদ্ধ করেছে। ঐ ঐক্যের কারণে আজ তারা উন্নতির শিখরে। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা তাদেরকে এ সাফল্য এনে দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম জাতি আজ সম্পূর্ণ পিছিয়ে। তারা নিজেদের ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে। তারা আজ বিবাদ-বিসম্বাদে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; নানা কারণে একতা বিনষ্ট করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (قران)

অর্থাৎ তোমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরো, আর দলাদলি করো না। আল্লাহ্‌ পাক আরো নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও। (হুজুরাত-১০)

মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও মত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। আর এ মতপার্থক্য নবী করীম (সাঃ)-এর প্রিয় সাহাবীগণের যুগ থেকেই চলে এসেছে। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করেছেন ঃ

যেমন ঃ ১। সহীহ মুসলিমের টীকা উদ্ধৃত করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী 'এনসাফ' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, "সাহাবাগণের মধ্যে কেউ একটি হাদীসকে সহীহ ধারণা করতেন, অন্য কেউ বাতিল ধারণা করে রদ করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ একটি সুন্নাত বলতেন, অন্যকেউ মোবাহ্ বলতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ একটি কাজকে মনসুখ ধারণা করেছেন, অপরে তা মনসুখ বলে স্বীকার করেননি।" এছাড়া 'মীযানে শায়া'রানী' নামক কিতাবে লিখিত আছে, "সাহাবাগণের মধ্যে ফরুআত মাসআলা-মাসায়েলে মতভেদ হয়েছিল। তাঁরা উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একে অপরের সংগে (বিপক্ষ) কলহ করেছেন, শত্রুতা করেছেন বা একে অন্যকে ভ্রমকারী বা ত্রুটিকারী বলেছেন বলে

আমরা মানি না।" এভাবে ইমাম তিরমিযী 'সহীহ তিরমিযী'তে শতাধিক মাসআলায় সাহাবাগণের মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

২। 'তাযকিরা' নামক কিতাবে উল্লেখ হয়েছে, "বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী বলেছেন, আলিমগণ সহজ মত দ্বীনের প্রচারক ছিলেন, আর সর্বাদা ফতওয়াদাতাগণ মতভেদ করেছেন। একজন এক বস্তুকে হালাল বলেছেন, অন্যজন তা হারাম বলেছেন। কিন্তু তাঁরা একে অপরকে দোষারোপ করতো না।"[২]

৩। মাওঃ শাহ ইসহাক দেহলবী 'মি'আতে মাসায়েল' কিতাবে লিখেছেন ঃ "সাহাবাগণের মতভেদ হওয়ার জন্য চার মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন মত হয়েছে। সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুসরণ করতে এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী (সাঃ) বলেন, আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র তুল্য, তোমরা তাঁদের মধ্যে যে কোন একজনের অনুসরণ করবে, সত্য পথ প্রাপ্ত হবে।"[৩]

৪। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী 'এনসাফ' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, "সাহাবা, তাবিয়ী ও তাবেতাবিয়ীগণের মধ্যে একদল নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তেন, আরেকদল পড়তেন না; একদল উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন, আরেক দল চুপে চুপে পড়তেন; একদল ফজরে 'কুনূত' পড়তেন, আরেকদল পড়তেন না, একদল লিংগ স্পর্শ ও কামভাবে স্ত্রীলোক স্পর্শ করার জন্য ওযূ করতেন, আরেকদল ওযূ করতেন না ইত্যাদি মাসআলাসমূহে তাঁরা মতভেদ করতেন।[৪]

৫। মুকাদ্দমায়ে ফতহুল বারীতে উল্লেখ হয়েছে যে, ইমাম বুখারী এমন কতকগুলো হাদীস সহীহ বলেছেন, পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম সেগুলোকে যঈফ বলেছেন। আবার ইমাম মুসলিম এমন কতকগুলো হাদীস সহীহ বলেছেন যেগুলোকে ইমাম বুখারী যঈফ বলেছেন। আবার ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী বুখারী ও মুসলিমের বহু হাদীস যঈফ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী উক্ত তিনজন মুহাদ্দিসের বর্ণিত বহু হাদীস যঈফ হওয়া প্রতিপন্ন হয়।[৫]

৬। এছাড়া উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ হয়েছে যে, দারমী, দারে কুতনী, আওযাঈ, আবূ হাতেম, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাত্তান, ইবনে সা'দ, ইবনে হাব্বান, জওযানি, শো'বা, ইয়াকুব ইবনে শায়বা, ইবনে হাযম, ইবনে খুযায়মা, সুফইয়ান বিন উয়ায়না ও আবূ নঈম প্রমুখ ৬৮ জন সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারীর বহু লিখিত হাদীসসমূহের বর্ণনাকারীগণের এবং বহু হাদীসসমূহের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন ও দ্বিরুক্তি করেছেন বা যঈফ বলেছেন।[৬]

৭। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেক মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারীর ৮০ জন হাদীস বর্ণনাকারীকে এবং মুসলিমের ১৬০ জন রাবীকে যঈফ বলেছেন। তাঁদের বর্ণিত অনেক হাদীসের ওপর জারাহ বা ত্রুটি তুলে ধরেছেন।[৭]

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তী যুগের ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মধ্যে অসংখ্য মতভেদ ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁদের পরস্পরের সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুণ্ন ছিল। এ সব মতপার্থক্য কোন দোষের বিষয় নয়। কারণ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতভেদ) রহমতস্বরূপ। আল্লাহ ও রাসূল সেই ইখতিলাফ নিষেধ করেছেন, যা ফিতনা-ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণেই সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের আহলে ইলম (বিদ্বানগণ)দের পরস্পরে ইজতিহাদী মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা অক্ষুণ্ন ছিল।

৮। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তাঁরা পরস্পরে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, "ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) কোন একদিন ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর কবরের নিকট ফজরের নামায আদায় করেন। তাঁর মাযহাবে ফজরের নামাযে দোআ কুনূত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু সেদিন তিনি 'কুনূত' পাঠ করেননি। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই কবরবাসীর (ইমাম আ'যম) আদব রক্ষার্থে কুনূত পাঠ করিনি। কেননা তাঁর মাযহাবে কুনূত পাঠ করার নিয়ম নেই। কেউ কেউ এও বলেছেন যে, সেদিন ইমাম শাফিয়ী বিসমিল্লাহও উচ্চস্বরে পড়েননি ও রফে' ইয়াদাইন করেননি। অথচ ইমাম শাফিয়ীর মাযহাবে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করার ও রফে' ইয়াদাইন করার নিয়ম আছে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে নিয়ম নেই।[৮]

অতএব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, দীর্ঘকাল যাবত আহলে হাদীস সম্প্রদায় হানাফী মাযহাবের প্রতি এবং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর প্রতি কটাক্ষ ও বিষোদগার করে মসলিম উম্মাহ'র মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও রেষারেষির বীজ ছড়াচ্ছে। ভবিষ্যতে এটা দাংগা-হাংগামার রূপ নিতেও পারে। এ সুযোগে ইসলামের দুশমনগণ মুসলিম মিল্লাতের একতা ও সংহতি বিনষ্ট করতে পারে। এটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। বিশেষত আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অবস্থা শোচনীয়। আজ বাংলাদেশের

মুসলমানেরা শতদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল আরেকদলকে দেখতে পারে না। এক আলেম আরেক আলেমকে দেখতে পারে না। এক পীর আরেক পীরকে সহ্য করতে পারে না। একভাই আরেক ভাইকে কাফের ও মুরতাদ বলতে দ্বিধাবোধ করে না। না, না, এটা ঠিক নয়। আমরা কিন্তু মুসলমান, আমরা উম্মতে মুহাম্মাদী। আমাদের এক আল্লাহ্, এক রাসূল, এক কোরআন, এক কিবলাহ্ হওয়া সত্ত্বেও আমরা একতাবদ্ধ হতে পারবো না কেন?

ছোট ছোট মুস্তাহাব বিষয় নিয়ে আমরা ঝগড়া করি, অথচ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও মাযহাবের ইমামদের দেখুন– তাঁরা একে অপরকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন এবং মুসলিম ঐক্যের প্রতি কতটা সতর্ক ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন রোম সম্রাট হযরত মুয়াবিয়ার কাছে প্রস্তাব পাঠান যে, আপনি যদি বলেন তাহলে আপনার বিরোধী পক্ষ আলীর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। হযরত মুয়াবিয়া তার জবাবে বলেছিলেন, "হে রোম সম্রাট! শুনে রাখো, যদি তুমি ও তোমার সৈন্যবাহিনী হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়, তবে আমি আমার ভাই আলীর সাথে মিলিত হয়ে উভয়ে একত্রিত হয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।"

ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে তারা কতটা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, এ ঘটনাটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুসলমানদের একটাই দল। ইহুদী, নাসারা, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক প্রভৃতি দল থেকে বেরিয়ে এসে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কায়েম করে একটা দল তৈরী হয়ে গেল– সেটা হলো মুসলমান। আর মুসলমানরাই ঐক্যবদ্ধ এক জাতি।

ঐক্যবদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলামের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। একতাবদ্ধভাবে না থাকলে নামায, রোযা পালন না করা সত্ত্বেও শক্তির আশা অবাস্তব বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এরূপ উল্লেখ হয়েছে। এ কথার উপর জোর দিয়ে নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন ঃ "জামা'আতের প্রতি আল্লাহর রহমতের হাত সম্প্রসারিত থাকে। যে জামা'আত থেকে বেরিয়ে গেল সে দোযখের অগ্নির মুখে ঝাঁপ দিল।"– তিরমিযী।

অতএব, আহ্লে হাদীস ভাইদের খেদমতে আরয– মাযহাবী কোন্দল, ফতওয়া-ফারায়েয ও হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে আমরা সকলেই পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হই এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখি।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন!

তথ্যসূত্র

১। কামিউল মুবতাদেয়ীন, ৩য় খণ্ড, প্রণেতা, মাওঃ রূহুল আমীন বসিরহাটী, পৃঃ—১২-১৩।

২। প্রাগুক্ত।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ—১০।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ—১২।

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ—১৯-২০।

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ—২২।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ—২০।

৮। মাসিক মদীনা (পত্রিকা), ১৯৫১, ২৭ বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা।

এ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী আলিমগণ দেখেছি। এতে উদ্ধৃত প্রতিটি দলীল বিশুদ্ধ বলে আমরা মনে করি। লেখকের অভিমতের সাথে আমরাও পরিপূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করি

১।

২।

৩।

৪।

৫। **মাওঃ মুহিউদ্দীন খান,** সম্পাদক, মাসিক মদীনা ও বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা, ঢাকা।

৬। **মাওঃ মুহাম্মদ সালেহ,** অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

৭। **মাওঃ রিজওয়ানুল কারীম,** প্রধান মুহাদ্দিস, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা এবং প্রাক্তন মুহাদ্দিস শর্ষিণা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা।

৮। **মাওঃ মুফতী আবদুল গনী,** মুহতামিম, বংশীপুর ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ আশরাফিয়া টাইটেল (দাওরায়ে হাদীস) মাদ্রাসা, শ্যামনগর।

৯। **মাওঃ মুফতী আবদুস সাদিক,** শাইখুল হাদীস, বংশীপুর টাইটেল মাদ্রাসা ও সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, বাংলাদেশ।

১০। **ডক্টর মাওঃ এ, এইচ, এম, ইয়াহইয়ার রহমান** (এম,এ, ডবল ও কামিল ট্রিপল), অধ্যাপক, আল-কোরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১১। **মাওঃ আবদুর রশীদ,** পীর সাহেব, রবগুনা।

১২। **মাওঃ সৈয়দ মুহাঃ মোসাদ্দেক বিল্লাহ,** কামিল ডবল, এম,এ, এম-ফিল, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেসাল ও সাহেবজাদা, চরমোনাই পীর সাহেব।

১৩। **মাওঃ নূরুল হুদা ফয়েজী,** সচিব, বাংলাদেশ কোরআন শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

১৪। **মাওঃ মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস এম,পি,** শাইখুল হাদীস ও মুফতী, যশোর রেলওয়ে স্টেশন মাদ্রাসা।

১৫। **মাওলানা মাহমুদুর রহমান**, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, খুলনা দারুল উলুম মাদ্রাসা।

১৬। **মাওঃ গোলাম রহমান**, প্রধান মুফতী, খুলনা দারুল উলূম মাদ্রাসা।

১৭। **মাওঃ শাহ্ আবদুল হক আব্বাসী**, পীর সাহেব গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি।

১৮। **মাওলানা মুহাম্মদ হাছান খানপুরী**, পীর সাহেব, খানপুর, সাতক্ষীরা।

১৯। **ডক্টর মাওঃ সোলায়মান**, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

২০। **মাওলানা মুফতী আবদুল গাফ্ফার**, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

২১। **মাওঃ আবদুল আজিজ**, সহযোগী অধ্যাপক, বি, এল, কলেজ দৌলতপুর, খুলনা, সাবেক অধ্যক্ষ হামিদপুর সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা।

২২। **মাওঃ এ,বি,এম, আসিরুদ্দীন**, কামিল ডবল ও এম, এ সহযোগী অধ্যাপক, (অবসরপ্রাপ্ত) সাতক্ষীরা।

২৩। **মাওঃ আখতারুজ্জামান**, হেড মুফতী, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্রাসা।

২৪। **মাওঃ আবদুল খায়ের**, কামিল ডবল ও এম, এ, প্রাক্তন হেড মুহাদ্দিস, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্রাসা।

২৫। **মাওঃ আবদুর রহমান**, কামিল ডবল ও দাওরায়ে হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ, শাইখুল হাদীস, বংশীপুর ... মাদ্রাসা, শ্যামনগর।

২৬। **মাওঃ হাসান আবদুল খালেক**, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

২৭। **হাফেয মাওঃ আবদুল আউয়াল**, খলীফা, চরমোনাই পীর সাহেব।

২৮। **মাওঃ মুহিউদ্দীন**, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, পাতাখালি ফাজেল মাদ্রাসা, শ্যামনগর।

২৯। **মোঃ আবদুর রহীম সরদার**, প্রধান ফকীহ, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

৩০। **মাওঃ কারী আবুল হুসাইন**, খ্যাতনামা ওয়ায়েজ, শ্যামনগর।

সমাপ্ত